বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী

সম্পাদক

আবু হামিদ লতিফ

নির্বাহী সম্পাদক

শফিউল আলম

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪১৩, ডিসেম্বর ২০০৬

বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী

সম্পাদকীয় পরিষদ

সভাপতি ও সম্পাদক : আবু হামিদ লতিফ
নির্বাহী সম্পাদক : শফিউল আলম
সদস্য : মমতাজ জাহান
শ্যামলী আকবর
বিবেকানন্দ হাওলাদার

প্রচ্ছদ
আবুল মনসুর

Bangladesh Shiskha Samoiki (Bangla Periodical), year-3, number-2, edited by Abu Hamid Latif and Shafiul Alam. Published by Nazmul Haq, Executive Secretary, Bangladesh Forum for Educational Development (BAFED). 278/3 Elephant Road (3rd Floor), Kataban, Dhaka 1205. Phone: 9668593, E-mail: bafed@bangla.net, Website: www.bafed.org

Printed by Arka, 6/11 Eastern Plaza, Hatirpool, Dhaka-1205, Phone: 9661129

Price Tk. 100.00
US$ 5.00

সম্পাদকীয়

সাধারণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সোপান হচ্ছে মাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তর উত্তরণের পর-শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ ও কারও কারও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা স্তরের কাঠামোগত সামান্য পরিবর্তন হলেও, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সঙ্গে এ-স্তরের যোগসূত্র ও মেলবন্ধন ঘটলেও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এর তেমন শুভপ্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে না।

স্বধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালে গঠিত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের পর এযাবৎ যতগুলো শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে সবগুলোর সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। সব ধারার শিক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রেখে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে পুনর্বিন্যাসের কথা প্রায় সব রিপোর্টেই বলা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার গুরুত্ব বিবেচনা করে, বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে এ স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে এ স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষাকে আধুনিকায়ন, যুগোপযোগী, প্রয়োগমুখী ও জীবনভিত্তিক করার জন্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার উদ্যোগে নানা প্রকল্প বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা হয়েছে। বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে তার ইতিবাচক ও উজ্জ্বল কোন দৃশ্য এখনও প্রতিভাত হয় নি।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শেখার দীর্ঘদিনের যে প্রবহমান ধারা ছিল সেখান থেকে ভাষাভিত্তিক ও অর্জনোপযোগী যোগ্যতাভিত্তিক ভাষা শেখার পদ্ধতিগত প্রণালী এ স্তরে প্রবর্তন করা যেমন সম্ভব হয় নি, তেমনি এ স্তরের জন্য পাবলিক পরীক্ষায় বাংলা ভাষা মূল্যায়নের নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের ধারায় বাংলা ভষার শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ও প্রায়োগিক কোন দক্ষতা তো অর্জিত হচ্ছেই না, বরং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য যতটুকু বাংলা শেখা প্রয়োজন তাও অর্জিত হচ্ছে না একজন এসএস সি পাস শিক্ষার্থীর। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হচ্ছে না। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অশনি সংকেতরূপে বিগত প্রায় তিন দশক ধরে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষা ও গণিত বিষয়ের প্রতি অনীহা। বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম মূল ভিত গণিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের এরূপ বিরূপতার পেছনে শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটি, শিক্ষকের মনোভাব, শ্রেণীকক্ষের অবস্থা, যথাযথ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিসহ নানা বিষয়ের মধ্যে আকীর্ণ বলে গবেষকগণ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলা ও বিজ্ঞান-শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরে যে অবস্থা বিদ্যমান সেখান থেকে শীগ্‌গীর উত্তরণ প্রয়োজন। 'বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকীর' এ সংখ্যায় মাধ্যমিক স্তরে এ দুটি বিষয়ের শিক্ষাদান পরিস্থিতি ও কিছুটা অতীত পটভূমি আলোচিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হওয়ায়, শিক্ষাবিষয়ক ধ্রুপদী লেখা রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' এ সংখ্যায় সংকলিত হল।

বাংলা ভাষার সহোদরা ভাষা 'ককবরক ভাষা' সম্পর্কিত পরিচিতিমূলক লেখাটি হয়তো অনেকের মনে এ ভাষা বিষয়ে কৌতুহল জাগ্রত করবে। আমরা আশা করবো শিক্ষাবিষয়ে তরুণ গবেষক, শিক্ষা ভাবুক, শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও মতামত দেবেন এবং শিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় আগ্রহী হবেন।

সূচি

শিক্ষা ও সংস্কৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭ - ৯

মাধ্যমিক স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষাদান পরিস্থিতি অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট
শফিউল আলম
১১ - ২৭

ককবরক ভাষা ও সাহিত্য
কুমুদ কুন্তু চৌধুরী
২৯ - ৩৮

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার পটভূমি
মুহাম্মদ আলী
৩৯- ৫৫

হেম্যাথ: একটি অনলাইন গণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মো: মোক্তার হোসেন
৫৭ - ৬০

গ্রন্থালোচনা
সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা
ড. মুহম্মদ আজহারুল ইসলাম
৬১ - ৬৪

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে.. আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগ্‌ড়িয়ে, ধুলায় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী? এত কাল ধরে যা-কিছু সে গড়ে তুলেছিল, যা-কিছুকে সে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্ত্ই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত্ফাঁক তা হলে সান্ত্না পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক; বলতে পারছে না 'আমার অন্ত্রে সম্পদ আছে'। আজ তার মূল্য নেই; কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ ক'রে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্ত্রের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল্ চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্ত্র কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল ক'রে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্য সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী ক'রে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্ত্রে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্‌ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে: শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন ক'রে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারি'। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এশিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'আমি সব জানব, সব পারব।' এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে যে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না– প্রাণপন সাধনা এমন-কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত– তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্বল-আত্মা!

'আমরা সব-কিছু পারব' এই কথা সত্য ক'রে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চির-পঙ্গু অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী ক'রে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধন করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু

ইতর বা কপট তার গ-ানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্ড়রিক পরিচয় থাকতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ ক'রেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ড় প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্ড়র করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করি নে; একটু উপলক্ষ ঘটবা-মাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতায় সমস্ড় দেশ মারীগ্রস্ড় হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ মেধার গুণে আমরা পড়া মুখস্থ করি; বি.এ., এম.এ. পাস করি; কিন্তু আত্মলাঘবকারী পরস্পরের সৌভাগ্যবিদ্বেষী নিন্দালোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকলপ্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল-াসে উঠে পড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহ-পূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ড় পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ড়মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর-একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ড়ব্যস্ড়থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে ক'রে অন্ড়ঃকরণে শান্ড়িআসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রী-ভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলেম শান্ড়িনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে, সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্ড়ই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি, তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়; অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে।

১৫ জুলাই ১৯৩৫, শ্রাবণ ১৩৪২

মাধ্যমিক স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষাদান পরিস্থিতি অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

শফিউল আলম *

১. আমাদের প্রচলিত 'শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রি শিক্ষার পূর্ববর্তী কার্যক্রম বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। মাধামিক শিক্ষা শিক্ষাকাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। শিক্ষার্থীদের বয়:সীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের শিক্ষা।' [২৮.১০ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট]

২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির গুরুত্ব প্রদান করে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়:

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমকে এমন ভাবে প্রণয়ন ও উন্নত করতে হবে যাতে আমাদের দেশ ও সমাজের প্রকৃত প্রয়োজন এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি ঘনিষ্ঠতর লক্ষ রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। [২৮.১১ প্রাগুক্ত]

উপরিবর্ণিত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এ রিপোর্টে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকেও পরিবর্তন আনার-প্রস্তাব করে বলা হয়:

বর্তমানে বিশ্বের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূহে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সময়ের পরিবর্তনের ও মানুষের জ্ঞানভান্ডার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপুল রূপান্তর ঘটছে, আমাদের দেশ এখনও তার প্রভাব থেকে যেন বাইরে রয়েছে। প্রায় এক যুগ পূর্বে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছিল, সামান্য রদবদল করে মোটমুটিভাবে তাই আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে চালু রাখা হয়েছে। এ ধরনের রক্ষণশীল, প্রাচীন-পন্থী, গতানুগতিক ও নিম্নমানের উপকরণ একটি প্রগতিশীল দেশের প্রয়োজনীয় উচ্চমানের শিক্ষার সহায়ক হতে পারে না। [২৮.২ প্রাগুক্ত]

১৯৭২ সালে গঠিত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠমো, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যাশা ও এ স্তরের শিক্ষার উপকরণের পরিমার্জন ও 'উচ্চমানের' শিক্ষা সম্পর্কে যে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে তা নানা বিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যদিয়ে বর্তমানে কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সে বিষয়টি আমরা এ লেখায় পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব।

প্রথমে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি ১৯৪৭ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে - তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত East Bengal Educational System Reconstruction Committee-র রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর, মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব, মাতৃভাষা ও অন্য দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে কি মতামত ও সুপারিশ প্রতিফলিত হয়েছিল।

---

* প্রফেসর শফিউল আলম – শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, প্রাক্তন পরিচালক, ব্যানবেইস, ঢাকা।

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকার ১৬ মার্চ, ১৯৪৯ গভর্ণমেন্ট রেজুলেশন নং ৬৫৯ Edn বলে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট যে-কমিটি গঠন করেছিল, সে কমিটি ১৯৫১ সালের ২৯ জুন, শিক্ষা বিভাগের সচিবকে লিখিত চিঠিতে পূর্ববঙ্গের 'Imbalanced System of Education' কে 'So as to make it more fitted to meet the new demands of this new state'-এ করার জন্য যে-সুপারিশ প্রণয়ন করে তাতে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত-এ খুদা শিক্ষা কমিশনের মতো প্রায় একই ভাষায় মতামত ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল -

'The present system of secondary education in our country has no aim and is not designed to serve any special purpose.' এ রিপোর্টে বৃটিশ আমলের বহুবিতর্কিত

মেকলের শিক্ষানীতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলা হয়-বৃটিশ প্রবর্তিত এ শিক্ষা ধারায় শুধু তাদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধন চরিতার্থ করা ছাড়া অন্যকিছু করতে পারে নি। তাছাড়া এ শিক্ষাধারায় দেশের মানুষের জীবন ও আদর্শের সংগে খুব সামান্য সংযোগও নেই। এ জন্য কমিটি তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষাকে 'aimless education' বলতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি। এ কমিটি তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে 'জুনিয়র' ও 'সিনিয়র' এ দুটি স্টেজে ভাগ করে ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ও ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থী দু' পর্যায়ে ৬ বছর মেয়াদকালীন করে ষষ্ঠ থেকে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ড় মাধ্যমিক শিক্ষার আওতায় আনার যেমন সুপারিশ করে তেমনি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে আবশ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে মাতৃভাষা শিক্ষার অবস্থান নির্ধারণ করে দেয়। এ রিপোর্টের সুপারিশে প্রাথমিক স্ড়র চতুর্থ শ্রেণীর পরিবর্তে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ড়বর্ধিত হওয়ায় জুনিয়র সেকেন্ডারি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং সিনিয়র সেকেন্ডারি নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ড় করার সুপারিশ করা হয়। জুনিয়র সেকেন্ডারিতে পাকিস্ড়ানের যে যে প্রদেশের যে যে মাতৃভাষা তার বাড়তি একটা 'স্টেট লাংগ্যুয়েজ' শেখার সুপারিশ করা হয়। আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট যদিও ১৯৫১ সালে জুনে পেশ করা হয় এ রিপোর্টটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ করা হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে। পাকিস্ড়ান সরকার অবশ্যি আগেই ঠিক করে নিয়েছিল পাকিস্ড়ানের 'স্টেট লাংগ্যুয়েজ' কী হবে। সে অনুযায়ী পাকিস্ড়ানের মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রভাষানীতি কী হবে তার একটি সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এ রিপোর্টের Chapter III-র Principle of Reorganisation of Secondary Education এর The curricula অংশে। এতে বলা হয় -

> In the curriculum for the junior stage of the secondary school recommended by us, a pupil have to learn as compulsory subjects two languages – his mother tongue and the language which will be adopted as the State Language of Pakistan. Till a decision is taken in regard to the State Language of Pakistan, *Arabic or Urdu shall be compulsory subject* for those where mother tongue is not that language and Bengali will be a compulsory subject for those where mother language is not Bengali.

তবে মনে রাখতে হবে আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটির এ সুপারিশ শুধু পূর্ববঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রণীত হয়েছিল। তাই পাকিস্ড়ানের এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের এ স্ড়রে উর্দু বা আরবি বাধ্যতামূলক পড়তে হলেও পাকিস্ড়ানের অন্য অংশের বেলায় তা প্রযোজ্য ছিল না। এ অঞ্চলের সামান্য সংখ্যক উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের

বাংলা পড়তে হত কিনা – এ সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান প্রবন্ধকারের জানা না থাকলেও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালি ছাত্রকে উর্দু আবশ্যিক পড়তে হয়েছিল। এ নিয়ম ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন পর্যন্ড়বলবৎ ছিল। এভাবে মাধ্যমিক স্ড়রের প্রথম থেকেই একজন বাঙালি শিক্ষার্থীকে আবশ্যিক উর্দু ভাষা শেখার বোঝা মাথায় নিয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়েছে। অন্যদিকে এ কমিটির রিপোর্টে পাকিস্ড়ান আমল ও পাকিস্ড়ান-পরবর্তী কয়েকটি শিক্ষা কমিশন/কমিটির রিপোর্টে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার গুর"ত্ব উলে- খ করা হয়েছে। এ রিপোর্টে অর্থাৎ আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটি রিপোর্টে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার ফলে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বলতর হবে সেগুবিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে দেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এ ভাবে-

> It should be the duty of teachers to advise pupils who have the capacity or inclination to go up for higher education to take up English as a compulsory subject as the university have not provided for the vernacularisation of the medium. (page 80, Report of the E. B. E. S. R. Committee.)

উপরিবর্ণিত উদ্ধৃতিতে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে,তখনো বাংলাকে ভার্নাকুলার হিসেবে অচ্যুতের দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখা হয়েছে, বাংলা ভাষা হিসেবে নয়। তারপরও এ কমিটি মাধ্যমিক স্ড়রে প্রতি বিষয়ের জন্য পাঠসামগ্রী, শিক্ষক নির্দেশিকা, উন্নত, নতুন ও আধুনিক পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি গঠনের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাকে গুর"ত্বপূর্ণ করে তোলার কথা বলে।

১৯৫৪ সালে ইস্ট পাকিস্ড়ান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর তিনেক পর কবি গোলাম মোস্ড়ফার সম্পাদনায় মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন (গদ্য ও কবিতা) প্রথম প্রকাশিত হয়। তাছাড়া পরিপূরক পাঠ হিসেবে বাংলা দ্র"ত পঠন প্রবর্তিত হয় নবম-দশম শ্রেণীর জন্য। নবম-দশম শ্রেণীর সাহিত্য পাঠেচ্ছু আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবর্তিত হয় উচ্চতর বাংলা। মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত দুটি বাংলা দ্র"ত পঠনের মধ্যে একটি গল্প সংকলন ও অন্যটি ইতিহাসশ্রয়ী মূলত মুসলমানদের অতীত গৌরবের কীর্তি কাহিনী বা ঐতিহ্য সম্পর্কিত পাকিস্ড়নি আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রণীত সহপাঠ বই। বাংলা ভাষার অভ্যন্ড়রীণ শৃঙ্খলা, সৃজনশীলতা, ভাষা-দক্ষতা ইত্যাদি অর্জনের জন্য বিস্ড়ৃত ও বিশেষিত শিক্ষাক্রম সে-সময় ভাবা হয় নি। আনুষ্ঠানিক ব্যকরণের পাঠ্যসূচিও ছিল নিতান্ড় গতানুগতিক ও পুরনো ধারা অনুযায়ী।

১৯৫২ থেকে ১৯৭২ পঞ্চাশ বছরের দু প্রান্ড়ের মাধ্যমিক স্ড়রের শিক্ষায় বাংলার অবস্থান কী ছিল তা একটু চোখ বুলিয়ে দেখার প্রয়াস এ জন্য যে, বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কী অগ্রগতি বা কোন মাত্রায় তা বিস্ড়ৃত হয়েছে একটু পর্যবেক্ষণ করা। লক্ষণীয় যে ১৯৭৪ সনের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশিন রিপোর্টে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্ড়রে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে আসে। এ রিপোর্টে বলা হয়;

> আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ভাষায় অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত উচ্চমান অর্জন করতে হবে। মাতৃভাষা বাংলায় তাদের দক্ষতা যথেষ্টভাবে ভবিষ্যৎ শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন ও তারা যে বৃত্তি অর্জন করবে তাতে সফলতা লাভে কার্যকর ভাবে সাহায্য করবে।

এ রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়–

বর্তমানে বাংলা ভাষা যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তার যথেষ্ঠ উন্নয়ন প্রয়োজন। যে-পরিমাণ সময় এজন্য ব্যয়িত হচ্ছে তাও যথেষ্ট নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বাংলা ভাষায় অধিক পারদর্শী হতে পারে এজন্য অধিক সময় বরাদ্দ করে উন্নত পদ্বতিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অবশ্য এর পর পর ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

স্বাধীন সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্রের ভাষানীতি কী হবে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষা শিখন পরিস্থিতির রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য এ রিপোর্টে না থাকলেও মোটামুটি ভাবে বলা হয়-

ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষার যে ভূমিকা রয়েছে তার গুরুত্ব সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনানুসারে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত সময় দিতে হবে। এ বিবেচনায় মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার আধুনিক ভাষাসমূহ শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় 'বিদেশী ভাষার স্থান' অংশে স্পষ্টভাবে বলা হয় –

১. বাংলা ভাষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু থাকবে। [৪.২-৪.৫ প্রগুক্ত]

২. বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তনের পরও আমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিখবার প্রয়োজন থাকবে। ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশ যা তাতে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অব্যাহত থাকবে। [৪.৬-৪.৮]

আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় অদক্ষতা, দুর্বলতা ও অকৃতকার্য হওয়া সম্পর্কে প্রায়শ কটাক্ষ করে বলা হয় - বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ইংরেজি শিক্ষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান দুরবস্থা ঘটেছে। এসব বক্তব্য যে কতটা দুরভিসন্ধিমূলক তা উপরিবর্ণিত কুদরাত-এ-খুদা কমিশিন রিপোর্টের সুপারিশ থেকে লক্ষ করা যাবে। মূলত বাংলা-ইংরেজি বিতর্ক নয়, মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শেখার গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে কিরূপ বিবর্তিত রূপের দিকে এগিয়ে গেছে তাই প্রতিভাত করা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারও এক দশক আগে তৎকালীন বঙ্গদেশে School Education in Bengal এর রিপোর্টেও শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরে বাংলা শিক্ষাদানের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে Handwriting & Reading এর ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তারা গদ্যে ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনী পড়ে দেশের মানুষের অনুসৃত ধর্ম, ব্যক্তিত্ব, জীবনকথা, নীতিবোধ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে এবং বাংলা কবিতার রসময় সৃষ্টিশীল ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবই কীরূপ হবে সে সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়– An illustrated reader of 150 pages (including 30 pages of poetry) of which 50 pages will be devoted to historical tales. প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইয়ের প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে 'Sentence' অথবা 'Look and Say' শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার কথা থাকলেও পরবর্তী সময়ে ব্যাক্যক্রমিক পদ্ধতি ও ভাষাভিত্তিক বাংলা শিক্ষাদানের চিন্তা তখনও এতে স্ফূরিত হতে দেখি না। তবে ১৮৫৪ সালে উড-এর ডেসপ্যাচে যখন থেকে এ দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় মাতৃভাষা

শিক্ষাদানের স্বীকৃতি লাভ ঘটে এবং ১৮৫৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এর অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাধ্যমিক স্ড়রে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১০০ নম্বর প্রবর্তিত হয় তখন থেকে আনুষ্ঠানিক বাংলা শিক্ষায় এক ধরনের পাঠ্যসূচির যে কাঠামো চলে আসছিল তার সর্বপ্রথম বিস্ড়ৃত বিন্যাস আমরা দেখতে পাই ১৯৭৫ সালে গঠিত ও ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে।

মাধ্যমিক স্ড়রে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদান সম্পর্কে এ রিপোর্টে বলা হয়-

> মাধ্যমিক স্ড়রের কিশোর শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্ড়র থেকে মাতৃভাষার সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত। সে মাতৃভাষা বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারে। মাধ্যমিক স্ড়রে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার জ্ঞানকে আরো সম্প্রসারিত ও উন্নত করে শিক্ষার্থীকে ভাষার শিল্পগুণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থী মাতৃভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে মাতৃভাষার শিষ্ট, সুষ্ঠু এবং শিল্পগুণসমৃদ্ধ চলতি রীতিতে সচ্ছন্দভাবে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারবে।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট - একটি আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীকে বাংলা প্রমিত চলিত ভাষার প্রয়োগে যেমন সক্ষম হতে হবে তেমনি সৃজনশীল শিল্পগুণসমৃদ্ধ বাংলার সুষ্ঠু প্রয়োগ-ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। শুধু তাই নয় এ রিপোর্টে আরও আশা ব্যক্ত করে বলা হয়, এ স্ড়রের শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার 'গঠন প্রকৃতি' ও 'আন্ড়রশক্তি' সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ভাষাকে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি মাধ্যমিক স্ড়রের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্যের কালক্রম অনুযায়ী বাংলা ভাষার উলে- খযোগ্য কবি ও লেখকদের লেখা সমন্বয়ে দুটি পৃথক মাধ্যমিক বাংলা কবিতা ও গদ্য সংকলন করার সুপারিশ করে। নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও সাহিত্যের কালক্রম অনুযায়ী গদ্য ও কবিতা সংকলনের পরামর্শ দেয়, পর্যাপ্ত টীকা-টিপ্পনী ও ভাষাভিত্তিক কাজ যেন অনুশীলনীতে থাকে সে পরামর্শ দেয়। গদ্যে ৩০ টি ও কবিতায় ৫০ টি পাঠ সংকলিত হয়। সে সংকলন থেকে পাঠ্যসূচির জন্য নির্ধারিতসংখ্যক গদ্য ও কবিতা পাঠ নির্ধারণ ছাড়াও এ শ্রেণীর উপযোগী বাংলাদেশের সমাজ- জীবন প্রতিফলিত হয়েছে এমন একটি উপন্যাস বা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ ও একটি তিন অঙ্কের নাটক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। মাধ্যমিক স্ড়রের বাংলার জন্য রয়েছে নির্ধারিত ব্যাকরণ পাঠ, রচনা ও বিরচন। ১৯৭৬ সনের সেই রিপোর্টের ধারাবাহিকতাই এখনও চলছে, যদিও ১৯৯৫ সনের পরিমার্জিত বাংলা শিক্ষাক্রমে ভাষা শিক্ষার চারটি দক্ষতাভিত্তিক 'অর্জিতব্য শিখনফল' সুনির্দিষ্ট করে উলে- খ করা হয় । অর্জিতব্য শিখনফলগুলো নিম্নরূপঃ

শোনা

১. বাংলায় রচিত গল্প/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/উপন্যাস/নাটক/কবিতা এবং সংশি- ষ্ট বিষয়ের আলোচনা মনোযোগসহ শুনে এর মূলভাব/তাৎপর্য সম্পর্কে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে।

২. বিভিন্ন পরিবেশে অপরের কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে এবং প্রয়োজনে তার সার কথাগুলো নিজের মত করে বলতে পারবে।

৩. নির্ধারিত কোন বিষয়ের আলোচনা আগ্রহ সহকারে শুনে তা বুঝতে পারবে এবং সৌজন্যবোধসহ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে ও যথাযথ উত্তর দিতে পারবে।

৪. কোন সমাবেশে বক্তব্য/আলোচনা শুনে সে বিষয়টির মূলকথা নিজের মত করে গুছিয়ে বলতে ও লিখতে পারবে।

৫. দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন পরিবেশে শোনা সংলাপ, আদেশ/নির্দেশের মূলকথা বুঝতে ও বলতে পারবে।

৬. গণমাধ্যমসমূহে প্রচারিত বংলা সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শুনে তার মর্ম বুঝতে পারবে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারবে।

বলা

১. চলতি রীতিতে প্রমিত ও শুদ্ধ উচ্চারণে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবে ।

২. বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে পঠিত অংশের মূলকথা নিজের ভাষায় গুছিয়ে বলতে পারবে ।

৩. নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে যে-কোন সহজ বিষয়ে নির্ধারিত বক্তৃতা/উপস্থিত বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৪. নির্ধারিত বিষয় অনুসারে বিতর্ক, যুক্তি খন্ডন এবং নতুন যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবে।

৫. নিজের দেখা কোন ঘটনা,অপরের কাছ থেকে শোনা কোন ঘটনা নিজের মত করে বলতে পারবে।

৬. দৈনন্দিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সহজ বর্ণনা দিতে পারবে।

৭. কোন অনুষ্ঠানে সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় সহমর্মিতায় সঙ্গে সম্বোধন, কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় প্রদান করতে পারবে।

৮. বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনায়/ঘোষণায় অংশ নিতে পারবে।

৯. বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযোগী কথা বলতে পারবে।

১০. একক ও বৃন্দ আবৃত্তি করতে পারবে।

১১. নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১২. কাল্পনিক অথবা মৌলিক বিষয় অবলম্বনে গল্প বলতে পারবে।

পড়া

১. বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্যবিষয়ক মুদ্রিত পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্রসহ সমমানের সব মুদ্রিত বিষয় স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবে।

২. পাঠের পর পঠিত অংশের মূলকথা চলিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে।

৩. স্বাভাবিক গতিতে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যের পাঠ ও সঠিক ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।

৪. বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকার বিভিন্ন অংশ ও বিভাগ পড়তে ও তার অর্থ বুঝতে পারবে।

৫. ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র, চুক্তিপত্র, স্মারকলিপি পড়তে ও বুঝতে পারবে।

৬. বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাহিত্যপাতাসহ অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকা পড়তে এবং পঠিত বিষয়ের মর্ম

গ্রহণ করতে পারবে।

৭. রেডিও টেলিভিশনের উপযোগী কথিকা পাঠ করতে পারবে।

৮. অভিধান দেখে প্রয়োজনীয় ও সুনির্দিষ্ট শব্দ/শব্দাবলির অর্থ পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং বাক্যে ও রচনায় তা প্রয়োগ করতে পারবে।

৯. জ্ঞানার্জন ও তথ্যসংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বিষয়ক বাংলা বইপুস্ড়ক ও পত্রপত্রিকা পড়তে আগ্রহী হবে।

১০. আনন্দ লাভের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ক বাংলা বইপুস্ড়ক, পত্রপত্রিকা পড়ার আগ্রহ সঞ্চার করবে।

লেখা

১. শুদ্ধ এবং আধুনিক বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করে লিখতে পারবে।

২. বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রাঞ্জল গদ্য লিখতে পারবে।

৩. বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন বিষয়ের (সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) পঠিত অংশের মর্ম অনুধাবন করে নিজের ভাষায় লিখতে পারবে।

৪. নির্বাচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে বিভিন্ন রীতিতে নিজের মত করে লিখতে পারবে।

৫. কোন ভাষণ/আলোচনা শোনার পর সঠিকভাবে নিজের মত করে লিখতে পারবে।

৬. চলতি রীতিতে নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারবে।

৭. ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র/দরখাস্ড়/আবেদনপত্র, অভিযোগপত্র, আমন্ত্রণপত্র, মানপত্র সহজ ও প্রমিত ভাষায় রচনা করতে পারবে।

৮. অভিধান দেখে শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

৯. অভিধানের সাহায্যে একটি শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ শিখে বাক্যে যথাযথ প্রতিশব্দটি প্রয়োগ করতে পারবে।

১০. প্রচলিত বাগ্‌ধারার অর্থ জেনে বাক্যে সঠিক প্রয়োগ করতে পারবে।

১১. কোন বিষয়ের ওপর নির্ভুলভাবে একটি/দুটি অনুচ্ছেদ দ্রুত রচনা করতে পারবে।

১২. সমকালীন লেখকের রচনা থেকে নতুন নতুন শব্দ বাছাই করবে এবং তা বাক্যে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

১৩. পত্র-পত্রিকায় স্থানিক, সামাজিক কিংবা জাতীয় কোন সমস্যা সম্পর্কে চিঠিপত্র অথবা রচনা লিখতে পারবে।

১৪. নিজের লেখা প্রবন্ধ/নিবন্ধ/গল্প কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১৫. বিভিন্ন জাতীয় দিবসের তাৎপর্য সম্পর্ক কথিকা লিখতে পারবে।

১৬. দেয়াল পত্রিকা/বিদ্যালয় বার্ষিকীতে লিখতে পারবে।

১৭. রোজনামচা, দিনপঞ্জি রচনা করতে পারবে।

পরিমার্জিত এ শিক্ষাক্রমে ১:শোনার দক্ষতার জন্য ৬টি, ২: বলার দক্ষতার জন্য ১২ টি, ৩: পড়ার দক্ষতার জন্য ১০টি এবং ৪: লেখার দক্ষাতার জন্য ১৭টি অর্জিতব্য শিখনফল নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালের এনসিটিবি কর্তৃক পরিমার্জিত ৯ম-১০ম শ্রেণীর বাংলার শিক্ষাক্রমে 'ভাববস্তু' ও 'বিষয়বস্তু' অনুযায়ী পাঠনির্মাণের নীতিমালাও তৈরি করে দেওয়া হয়। তাছাড়া পত্রবিভাগ, প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টনে দেখা যায় দুই পত্রের ২০০ নম্বরের মধ্যে ১ম পত্রে গদ্যে ৩০ নম্বর, কবিতায় ২০ নম্বর, উপন্যাসে ১০ নম্বর ও নাটকের জন্য রাখা হয়েছে ১২ নম্বর। এ পত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য গদ্যে-৮, কবিতায়-৭, উপন্যাসে-৫, ও নাটকে রাখা হয়েছে ৫ নম্বর। ২য় পত্রে প্রবন্ধ রচনায় ১৫ নম্বর,পত্র লিখনে ১০,সারাংশ/সারমর্ম ১০, ভাবসম্প্রসারণ ১০, ব্যাকরণ ১৫, বাগ্‌ধারা ১০, ভাষারীতির রূপান্তর ৫ নম্বর। এ পত্রে ব্যাকরণ অংশের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য রাখা হয়েছে ২৫ নম্বর।

১৯৯৫ সালে প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের বাংলা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে অভ্যন্তরীণ ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ভাষাদক্ষতা মূল্যায়নের কথা বলা হয়।

ভাষা দক্ষতা মূল্যায়ন

১. ধৈর্যসহকারে শোনার মূল্যায়ন : আদেশ/নির্দেশ অনুসরণ, ত্বড়িৎ-সাড়া, কাল-ক্ষেপভাবনা ইত্যাদি সম্পাদন ছকে (performance table) লিপিবদ্ধ রাখা;

২. প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা, তর্ক-বিতর্ক, দলগত আলোচনা, অনুকরণ;

৩. পঠনের বাড়ির কাজ: পূর্ব-পাঠন, পর-পাঠন, পাঠ (Text) গুণাগুণতি (শব্দ, বাক্য, বাগ্‌ধারা ইত্যাদির সংখ্যা নিরূপণ), নতুন শব্দ সংগ্রহ-নিবন্ধন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, শব্দের উপযুক্ত ও যথাযথ প্রয়োগ,

- চিহ্নিতকরণ-বাগ্‌ধারা, পরিভাষা, ব্যাকরণগত বর্গ,

- শব্দ নিয়ে খেলা-শব্দ গঠন, বর্ণ পরিবর্তন

৪. শ্রুতিলিপি-শ্রুতিলিপিশোধন, যুক্তিবিন্যাস, অনুচ্ছেদ লিখন, বাক্য পরিবর্তন ও বাক্য যোজনা, রচনা লেখা।

সাহিত্যবোধ: মূল্যায়নের জন্য কর্মতৎপরতা

১. পুনর্ব্যক্তকরণ-(retelling)

২. অলংকার চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহার

৩. মিলকরণ

৪. অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও লেখা, রচনা লেখা

৫. সমার্থক শব্দ, প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি।

ত্রৈমসিক,যান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা: নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন

বহি:পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন: উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন।

উন্নত প্রশ্নমালার মাধ্যমে এ স্তরে পরীক্ষা পরিচালিত হবে। পরীক্ষায় নিম্নরূপ প্রশ্নমালা সন্নিবেশিত হবে:

- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন: শতকরা ২৫ ভাগ

- রচনামূলক প্রশ্ন শতকরা ৭৫ ভাগ

বহি:পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক: এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলোর প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে:

- নৈর্ব্যক্তিক জিজ্ঞাসা

- পাঠবিশে- ষণাত্মক জিজ্ঞাসা

- সৃজনশীলতা যাচাইকরণ জিজ্ঞাসা

- তথ্য-সঞ্চয়ন দক্ষতা জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন-প্রণয়ন নীতিমালা

১. প্রশ্নের মান অবশ্যই উন্নতমানের হবে।

২. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে আরোপিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. পাঠের যে-অংশ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার সাহায্যে মূল্যায়নযোগ্য, সে ক্ষেত্রে রচনামূলক প্রশ্ন না রাখাই বাঞ্ছনীয়।

৪. রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ-উত্তরমূলক প্রশ্ন,সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন,ব্যাখ্যা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হবে।

৫. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য চারটি আচরণীয় যোগ্যতা, যেমন, জ্ঞান, মানসপ্রবণতা, দক্ষতা ও প্রায়োগিক নৈপুণ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালায় প্রত্যক্ষ প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য-মিথ্যা নিরূপণ, মিলকরণ এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. উপযুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশ্নকর্তার সাহায্যে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক। প্রয়োজনে সংশি- ষ্ট কার্যক্রমের (মূল্যায়নের) জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল এ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মূল যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এ স্তরের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে তার বিন্দুমাত্র যেমন প্রতিফলন নেই তেমনি শ্রেণীকক্ষে যারা মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা দেন ওপরের বিষয়গুলোও তাঁদের সম্যক জানা নেই।

নবম-দশম শ্রেণীর বাংলার শিক্ষকদের জন্য ১৯৯৭ সালে এন সি টি বি কর্তৃক যে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয় তা মূলত মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য ও কবিতা পাঠ্যদানের নির্দেশিকা, এ শ্রেণীর সামগ্রিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির জন্য নয়। বর্তমানে দুস্প্রাপ্য এই শিক্ষক নির্দেশিকার 'প্রসঙ্গ কথায়' এনসিটিবির চেয়ারম্যান নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে কি কি প্রয়োজনের নিরিখে এ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তা বর্ণনা করে বলেছেন-

- (বাংলা) পাঠ্যপুস্তকের সফল পাঠদানে শিক্ষককে সহায়তা দান ।

- শিক্ষার্থীর শিখন ফল অর্জনে সহায়ক পদ্ধতিতে পাঠদানের ব্যাপারে শিক্ষককে পরামর্শ দান

- যথাযথ মূল্যায়নের উপর ও কৌশল সম্মন্ধে শিক্ষককে সহায়তা দান ইত্যাদি।

শুধু বাংলার ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও যা প্রযোজ্য তা হচ্ছে – আমাদের দেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের পর শ্রেণীকক্ষে প্রবর্তনের আগে শিক্ষাক্রম বিস্ড়রণের (Curriculum Dissemination) কাজটি কখনো গুর ত্ব লাভ করে নি। ফলে শিক্ষকদের কাছে শিক্ষাক্রমের মূল বার্তা (Message) টি কখনও তাদের কাছে পৌঁছে না। তাঁদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় না। মাতৃভাষার বাংলার গুর ত্ব Curriculum Document–এ ফলাও করে প্রচার করা হলেও মাধ্যমিক স্ড়রের পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নের সার্বিক দায়িত্ব দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের ওপর ন্যস্ড়। এস্ড়রে মাতৃভাষার মূল্যায়নের জন্য যাঁরা পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তাঁরা অনেকেই এ স্ড়রে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন, তাঁদের সামনে থাকে শুধু পাঠ্যবই, তাও অনেক সময় প্রশ্নপ্রণয়নকারীরা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত নন বলে অভিযোগ পাওয়া যায় যখন প্রশ্নপত্রে থাকে মারাত্মক রকমের ভুল। অথচ পাবলিক পরীক্ষার এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকার কথা শিক্ষাক্রমপ্রণেতা ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের, যাঁদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রয়েছে এমন ব্যক্তি। অথচ এসব কথা ভাববার অবকাশ নেই কারো।

মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে আমাদের প্রদর্শিত আবেগ ও বাইরের প্রচারণার সঙ্গে যে আমাদের বাংলা ভাষার পাঠদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গতি নেই তার শত শত দৃষ্টান্ড় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বাংলা সাইনবোর্ড, নানা রকম ব্যানার, পোস্টার, প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তিতে আমরা অহরহ দেখতে পাই। 'শ্রদ্ধাঞ্জলী', 'বাণী অর্চ্চণা', 'দূর্গাপূজা', 'জাতীর পিতা', 'ঐতিহাসিক ভাষন', 'সম্বর্ধনা', 'উচিৎ', 'সমিচিন' ইত্যাদি বানান দেখতে দেখতে আমরা এতই অভ্যস্ড় যে একদিন হয়তো এসব বানানই শুদ্ধ বলে গৃহীত হবে। বানানের কথা বাদ দিলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে একজন মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষাপাস বা মাধ্যমিক স্ড়রের শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় যতটুকু দক্ষতা অর্জিত হওয়া উচিত তা কি কখনো হচ্ছে? একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে – প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলার গুর ত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে কতটুকুইবা দেওয়া হচ্ছে।

১৯৯৫ সনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড 'একমূখী শিক্ষা' প্রবর্তনের আওতায় 'বহুনির্বাচনী ও কাঠামোবদ্ধ' প্রশ্ন তৈরির পরিকল্পনা করে। এ উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্ড়ক প্রণেতা ও শ্রেণীমূল্যায়নের জন্য 'পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষক নির্দেশিকা'ও প্রণয়নের করে। এতে একজন শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর জ্ঞান (Knowledge), অনুধাবন (Perception) ও প্রয়োগ (Application) ভাগ করে প্রশ্ন করার নমুনাও দেওয়া হয়। কিন্তু এ দক্ষতাগুলো কী তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এ নির্দেশিকার প্রণেতারা যা বলেছেন তা অন্ড়ত মাতৃভাষা বাংলার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে ভাববার বিষয়। যেমন 'প্রয়োগ' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ৯ম-১০ম শ্রেণীর বাংলার নির্দেশিকায় বলা হয়েছে –

> প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। বিধি, তত্ত্ব নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগের মধ্যে আরও অন্ড়র্ভুক্ত চার্ট, গ্রাফ তৈরি করা, পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার প্রদর্শন এবং হিসাব-নিকাশ করা। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যবইতে পাওয়া যায় না।

'পাঠ্যবইতে' পাওয়া না-যাওয়াটা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়, প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, ভাষার শুদ্ধ, শিষ্ট ও সুষ্ঠু প্রয়োগ ক্ষামতা অর্জন এবং সচ্ছন্দে শোনা, বলা, পড়া

ও লেখার অর্জিতব্য যোগ্যতাসমূহ অর্জন করা। এ নির্দেশিকায় শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। উচ্চতর দক্ষতার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

> 'এতে বিশে- ষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশে- ষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ), এবং মূল্যায়ন (ভালমন্দ বিচার করা) দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত। উচ্চতর দক্ষতার আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ হল বিভিন্ন ধরনের এক গুচ্ছ তথ্য সংগঠিত করা, তথ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা নিয়ে একটি কাঠামো বা নক্সা তৈরি করা। কোন মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। এটি দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর। এর মধ্যে নিম্তর স্তরের অন্যসব বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত।

ওপরের উদ্বৃতি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলার উচ্চতর দক্ষতা নিরূপণের জন্য এ মাপকাঠি কোন ইংরেজি শিখন পদ্ধতির বই থেকে হুবহু বাংলা অনুবাদ। বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে, ভাষার দক্ষতা পরিমাপের জন্য এ ধরনের মাপকাঠি অন্যান্য তথ্যবহুল বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অন্তত নয়। সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে বাংলা বিশেষজ্ঞদের, ভাষা বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে দিন দিন বহুনির্বাচনী প্রশ্নের যে-ভাবে বিস্তার ঘটছে তা নবম-দশম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনছে। 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের গঠন বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে উপরি উলে- খিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে –'পরীক্ষাকে অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বিশেষভাবে গঠন করা হয়েছে।'

ইংরেজি Structured Question এর বাংলা করা হয়েছে 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন'–এ পরিভাষা কি যথার্থ ও অর্থবহ ? তাছাড়া এনসিটিবির ইংরেজি টেক্সট বই Structured, সে বইগুলো ইংরেজি ভাষায় Verb এর ব্যবহার, Article এর ব্যবহার, Subject- Predicate এর ব্যবহার ইত্যাদি ঐ ভাষার নিয়মানুযায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে এনসিটিবির নিম্মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যবইগুলো 'Structured' নয়, Language Basedও নয়। এ বইগুলো বাংলা ভাষা শিখানোর পুরনো ঐতিহ্যবাহী ধারার সঙ্গে কিছু নতুন মাত্রা সংযোজন করে পর্যাপ্ত শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী ও প্রশ্নাবলি দিয়ে সাজানো এবং বইগুলোর রচনা ও সংকলনে শিক্ষাক্রমের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সংগতিপূর্ণ করে রচিত। কাজেই যেগুবই 'Structured' নয়, যে পাঠসামগ্রী ভাষাভিত্তিক নয় তার মূল্যায়ন কী ভাবে Structured হয় তা বোধগম্য নয়। তবে যাই হোক, একমুখী শিক্ষা ২০০৭ পর্যন্ত 'আপাতত স্থগতি' হওয়ায় আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা 'আপাতত' এই নতুন পরীক্ষার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।

এ প্রবন্ধের সূচনায় একটি কথা উলে- খ করেছি– মাধ্যমিক স্তরে বাংলা শেখার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু অগ্রগতি সাধন করেছি সংক্ষেপে তার একটু হিসেব-নিকেশ পর্যালোচনা করে দেখা। এ প্রসঙ্গে প্রায় একশ বছর আগে অর্থাৎ ১৩১৬ সনে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের অনুমোদিত শ্রীসাদত আলী খাঁ বি.এ প্রণীত ও আশুতোষ লাইব্রেরি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত *সাহিত্য কুসুম* বইটি ছিল 'Intended for classes V and VI of High & M.E. school,'বইটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত' হলেও বলা হয়েছে 'Intended for', এনসিটিবির ভাষায় 'নির্ধারিত' নয়। সেকালে যেহেতু বাংলা প্রমিত চলিত ভাষার প্রচলন হয় নি এ পাঠের প্রত্যেকটি গদ্যই সাধু ভাষায় রচিত এবং এ বইয়ের ১৩ টি গদ্য পাঠই তৈরি করা, সংকলিত নয়। পাঠের শেষে কোন অনুশীলনী নেই। এ বইয়ে ৮টি কবিতা সংকলন করা হয়েছে। তা হলে দেখা যাক পাঠের ভারসাম্যের দিকে। এতে গদ্য পাঠ ৬০% এবং কবিতা ৪০%, অন্যদিকে গদ্য রচনাগুলোর

বিষয়বস্তুও লক্ষণীয়। যেমন-

১.তাজমহল ২.থিউডোর পার্কার ৩.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৪.অসাধারণ কর্তব্যজ্ঞান ৫.প্রকৃত বন্ধুতা ৬.স্বাস্থ্য ৭.সময় ৮.সত্য ৯.সক্রেটিস ১০.পরিশ্রম ১১.অধ্যবসায় ১২.হজরত ইব্রাহীম ১৩.মুরশিদ কুলি খাঁ। গদ্য সংকলনে নেই কোন গল্প, নাটিকা বা নাট্যাংশ। এ বইয়ে সংকলিত ৮টি কবিতা– ১.নিখাদ দিনান্ড়, ২.পানীপথ, ৩.বটবৃক্ষ, ৪.নাজিরউদ্দিন, ৫.বসন্ড়পঞ্চমী, ৬.পরার্থপরতা, ৭.শরদ্বর্ণনা, ৮.চাতক। শ্রীমতী কমিনী রায়ের 'পরার্থপরতা' ও শ্রী নবীনচন্দ্র সেন-এর 'আশা' কবিতা ব্যতীত অন্য কবিতাগুলোতে কবির নাম নেই। এ গুলো কি সংকলিত না সংকলকের লেখা বুঝা গেল না। 'সাহিত্য কুসুম' বইয়ের অধিকাংশ গদ্যপাঠ অত্যন্ড়ঋঝু, ধ্র্পদী ও এখনকার শিক্ষার্থীদের জন্য জটিল বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে কবিতার সংকলনেও তেমন বৈচিত্র্য নেই। তবে যে-বিষয়টি এখানে পরিস্ফুট তা হল, ভাষা শেখার যে মান, বিষয়বস্তুর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ার যে একটা প্রচেষ্টা রয়েছে তা খুব সহজেই লক্ষ করা যায়। এমনকি সে সময়ে কলকাতা মাদ্‌রাসার নবম দশম শ্রেণীর জন্য তৈরিকৃত মাধ্যমিক বাংলা সংকলনেও কোন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির যেমন পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি মাদ্‌রাসার ছাত্র হিসেবে তাদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ও শিক্ষাপরিকল্পকদের মধ্যে তখন দেখা যায় নি।

অন্যদিকে সে সময় ১৯১৬ সালে ম্যাকমিলান এ্যান্ড কোং লিমিটেড (কলিকাতা, বোম্বে ও লন্ডন) কর্তৃক প্রকাশিত রায় বি. সি. বসু বাহাদুর (এসিট্যান্ড ডিরেক্টর ল্যন্ড রেকর্ডস এ্যন্ড এগ্রিকালচার) ও এ. মজিদ বি.এ.এল.এল.বি. (ডিস্ট্রিক্ট এ্যন্ড সেশন জজ, রাজশাহী) কর্তৃক প্রণীত Bengali Lower Primary Reader Book-1 – নিম্ন প্রাথমিক পাঠ- প্রথম ভাগ এর ৪১ টি পাঠের মধ্যে 'পদ্য' রয়েছে মাত্র ৪ টি। অর্থাৎ এখানে গুর্ত্ব প্রদান করা হয়েছে গদ্য পাঠের ওপর। শ্রী মদন মোহন তর্কালঙ্কারের 'প্রভাত বর্ণন' (পাখি সব করে রব. . . নিবেশ), শ্রী জগচ্চন্দ্র সেন-এর 'শেফালিকা', শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহের 'পারিব না' (পারিব না একথাটি বলিও না আর . . . বার বার), ও 'ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি,' (কবির নাম নেই) এ চার টি কবিতা ছাড়া ৩৭ টি গদ্য রচনা নিম্নরূপঃ

১. খরগোস ও কচ্ছপ ২. আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না ৩. গাছ ৪. কাক ও শৃগাল ৫. কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থ ও গ্যাস ৬. মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৭. আমাদের নিত্য দাস ৮. দ্রব হওয়া ৯. অমিতব্যয়ী পুত্র ১০. মাতৃহে ও অপূর্ববিচার ১১. সেন বংশের তিরোভাব এবং সুবর্ণ গ্রামে নূতন রাজধানী স্থাপন ১২. প্রাচীন কামরূপ ১৩.অতিলোভী ১৪. উদ্ভিদেরা মূলটি দিয়া মাটি হইতে আহার সংগ্রহ করে ১৫. প্রাচীন গৌড় ১৬. তুগ্রল খাঁ ১৭. ব্রাক্ষণ ও বেজী ১৮. বড়াই করিতে নাই ১৯. অঙ্কুর ২০. বঙ্গের সেন রাজ বংশ ২১. মূল ও কান্ডের স্বভাব ২২. একতাই বল ২৩. নানাবিধ মূল ২৪. ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তি ২৫. পূর্ববঙ্গ ও বাহাদুর খাঁ ২৬. নৌকা ও ষ্টীমার ২৭. রাজা ও রাখাল বালক ২৮. মহারাজ বল-াল সেন এবং তাহার সময়ের একাট মুসলামান পরিবারের গল্প ২৯. বাবা আদম ও মহারাজ বল-াল সেন ৩০. ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩১. দুগ্ধ ৩২. হাজী মোহাম্মদ মোহসেন ৩৩. বিড়াল ৩৪. শাহজালাল ৩৫. ধাতু -লৌহ ৩৬. চট্টগ্রাম ৩৭.স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র।

বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিষয়গুলোর সঙ্গে মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী এ পাঠে যেমন অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির জীবন ও জীবন ধারার বিষয়বস্তু একত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠের সব গদ্য রচনা সাধু ভাষায় রচিত,

পাঠশেষে কোনো অনুশীলনী নেই এবং নীতিবিষয়ক লেখার প্রাধান্য লক্ষণীয়।

এ কবিতা সংকলনে অক্ষয় কুমার বড়াল, শ্রী অমৃতলাল বসু, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম নন), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমতী কামিনী রায় বি এ, শ্রী কায়কোবাদ সাহেব (কবি কায়কোবাদ), শ্রী কালিদাস রায় বি এ, কবি শেখর, শ্রী কুমার নাথ মূখোপাধ্যায়, শ্রী কুমুদ রঞ্জন মলি- ক বি.এ; শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, শ্রী গিরিজানাথ মূখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, গোবিন্দচন্দ্র রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রী জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, যোগীন্দ্র নাথ সরকার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ, বিশী , শ্রী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি.এ, শ্রী নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকান্দ), রজনীকান্ড় সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্র রায়, শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, নবীনচন্দ্র দাস, কবি গুণাকর এম.এ. বি,এল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম,এ, স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি,এল; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা সংকলন ছাড়াও শ্রী মদ্‌ভাগবত গীতা , কুমারসম্ভব ও মেঘদূত কাব্যগন্থ থেকে অনুবাদমূলক কবিতা সংকলিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিক বাংলা পাঠ রচনার যে আদর্শ ও নীতিমালা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বাংলা প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে অনুসরণ ও প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে তারই বিস্ড়ৃতি ঘটেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের সংকলন গ্রন্থে কবিতার পাঠ বুঝবার জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনী না থাকলেও শব্দার্থ, টীকা ও কবি-পরিচয় রয়েছে। কবিতা-শেষে প্রশ্নের সংখ্যা খুবই কম এবং প্রখ্যাত মুসলমান কবিদের মধ্যে তখনও কায়কোবাদ ছাড়া আর কোন কবির কবিতা সংকলিত হয় নি। পাঠশেষে অনুশীলনী আমরা লক্ষ করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম-দশম শ্রেণীর অর্থাৎ এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য বাংলা কবিতা সংকলন 'কবিতা রত্নাবলী' তে। প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে কবির ছবি সংবলিত এ সংকলনে পরিশিষ্ট 'ক' অংশে টীকা বা Notes ও পরিশিষ্ট 'খ' অংশে কবি পরিচয় সংযোজিত হয়েছে এবং অনুশীলনীকে ইংরেজি Exercise হিসেবে প্রশ্নপত্রও ইংরেজিতে করা হয়েছে। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কবির প্রার্থনা' কবিতার Exercise নিম্নরূপঃ

১. Give at least two different meanings of each: স্বামী, পাশ, বর, অনন্ড়, মাসা, গুরা, পদ, মনি, দাস, রস।

২. Distinguish between শূর and সুর, ভাষা and ভাসা, বর and বড়, আকিঞ্চন and অকিঞ্চন ইত্যাদি।

পরিশেষে একথা বলা যায়– বিগত একশ বছরের বেশি সময় ধরে নানা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, সর্বোপরি ১৯৫২ সালের অমর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাভাষাকে দিয়েছে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি ও গৌরব, অহংকার ও নতুন মাত্রা। ১৯৭২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ড় আমাদের দেশে ন্যূনপক্ষে আটটি শিক্ষা কমিশন/কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক রিপোর্টে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের কথা গুর ত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার কথা বলা হয়েছে – কিন্তু বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য যে–পর্যাপ্ত পরিমাণ, জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল, স্থাপত্য, চিত্রকলা, শিল্পকলা, বাস্ড়ুবিজ্ঞানসহ অন্যান্য শাখার উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পর্যাপ্ত পাঠপুস্তক রচনার কথা তা শুধু 'সুপারিশের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, বাস্ড়বে রূপায়িত হয় নি। এসব সুপারিশ রূপয়িত না হওয়ার পেছনে অনেক বিশে- ষক, বুদ্ধিজীবী নানা মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া

১. শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য এখনো কোন ভাষানীতি প্রণীত হয় নি।

২. মাধ্যমিক স্তরে দক্ষতাভিত্তিক বাংলা শিক্ষাদানের রূপরেখা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে লিপিবদ্ধ করা হলেও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া এ তিনটি ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে মূল্যায়নের বাইরেই রয়ে গেছে।
৩. ১৯৯৫ এ নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য পরিমার্জিত বাংলা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য যে ১৩টি সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছিল সেগুলোর কোনটাই বাস্তবায়িত হয় নি।

সুপারিশগুলো নিম্নরূপ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সুষ্ঠু ও যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করেছে–

১। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শ্রেণীকক্ষে তা বাস্তবায়নের পূর্বে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণী শিক্ষক এবং সংশি- ষ্ট অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কর্মশিবিরের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন।

২। নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীকক্ষে সফলভাবে প্রবর্তনের জন্য সংশি- ষ্ট শ্রেণী শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন।

৩। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রান্তিক পরীক্ষার সঠিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক।

৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের মূল্যায়নের জন্য মান বণ্টনের ধারা নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

ক. মাধ্যমিক স্তর:	বর্ণনামূলক	–	৭৫ নম্বর
	নৈর্ব্যক্তিক	–	২৫ নম্বর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতিমালা অনুসরণ করার যুক্তি হল, ভাষা শিক্ষা এবং সাহিত্য পাঠ কোনক্রমেই কেবল তথ্যনির্ভর হতে পারে না। বরং ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষার্থী কতখানি মৌলিকত্ব এবং নিজস্ব প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করেছে তার বিচার হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৫। মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি পিরিয়ড যথাক্রমে ৪৫ মিনিট ও ৫০ মিনিট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যেহেতু শিক্ষার্থীর নিবিড় মনোযোগ ও অনুকূল শ্রেণী-পরিবেশ প্রয়োজন সে জন্য ক্লাসের শিক্ষার্থী সংখ্যা সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। শ্রেণীকক্ষেও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতও সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭। শিক্ষার্থীর পাঠ্যস্পৃহা বৃদ্ধি ও প্রাসঙ্গিক পাঠের সহায়ক গ্রন্থের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৮। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে সহায়তা দান এবং পাঠ ও পাঠের অংশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভের জন্য অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেটের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

সংশি- ষ্ট পাঠের অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট পাঠ-উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড মানসম্মত অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট অনুমোদন দিতে পারে।

৯। শিক্ষার্থীদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ও তাদের সৃজনশীলতার বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড প্রাইজ বুক বা উপহার গ্রন্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারে। এই তালিকা বোর্ডের অনুমোদিত বইয়ের গেজেটের সঙ্গে প্রকাশিত হবে। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়সমূহ তাদের গ্রন্থাগারের জন্য এ তালিকা অনুসরণ করে বই ক্রয় করতে পারবে।

১০। মাধ্যমিক স্ড়রের সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্ড়ক রচনা, পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে ভাষার সমতা, শব্দভা ার ব্যবহার এবং বানানরীতি ও বাক্য প্রয়োগের মধ্যে আনুপূর্বিক সমন্বয় ও সমতা সাধনের জন্য বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

১১। সাধারণ পরীক্ষার (Public Examination) সময় স্থানাভাবে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শ্রেণীপাঠ রহিত করা হয়। তাতে পাঠদান পদ্ধতি ও অগ্রগতির সমূহ ক্ষতি হয়। এ কারণে নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্র (Examination Centre) রাখার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২। একটি চলমান জাতির ধারাবাহিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় ও উপাদান সংযোজন করা হয়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি জাতির শিক্ষা জীবনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ। সেজন্য প্রতি দশ বৎসর অন্ড়র দেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নবায়ন করা এবং তৎসম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১৩। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্ড়রের পাঠ্যপুস্ড়ক প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ কমিটি মনে করে যে,

- বাংলা ভাষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্ড়কসমূহ খোলাবাজার থেকে গ্রহণ না করে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে নির্বাচিত বা মনোনীত লেখকদের দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বই লেখানো সংহত হবে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়রের মাতৃভাষা বাংলা বিষয়ে পাঠ সংকলন গ্রন্থসমূহ কালানুক্রমিক লেখক সূচি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হলেও শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সহজ থেকে কঠিন রীতিতে বিষয়াবলি নির্বাচন করে পাঠ দেবেন।
- যেহেতু মাধ্যমিক স্ড়রের মাতৃভাষা বিষয়ের পাঠ সংকলন গ্রন্থ কেবল বিশিষ্ট লেখকদের সাহিত্য-রচনা-নির্ভর হবে না, তাই ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর সঠিক প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে লেখকদের দিয়ে যথার্থ এবং প্রয়োজনীয় পাঠ লিখিয়ে নিতে হবে।
- প্রত্যেক বইয়ের প্রকাশনার মান অবশ্যই উন্নত ও র চিসম্মত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় গ্রন্থনীতি অনুসরণ করা সংগত।
- পাঠ্যপুস্ড়ক প্রণয়নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ডের বানান রীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

৪. ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষা স্ড়রে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সারাৎসার হল-

শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীর জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সে ক্ষেত্রে সহজ বাংলা

আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে। [রিপোর্ট প্র: ১২]

এ স্ড়রে মাদরাসা শিক্ষায় বাংলা ভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে বলা হয়েছে- মাদরাসা শিক্ষার সকল স্ড়রে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা, তবে ক্ষেত্র বিশেষে আরবি ভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে। [ঐ রিপোর্ট প্র: ১৪]

এ যাবৎ প্রকাশিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টগুলোতে বাংলা আবশ্যিক হিসেবে উলে- খ করা হলেও এর বিকল্প'ভাষা শিক্ষারও সুযোগ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হলেও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত পাঠ্যবই রচনা ও অনুবাদের সল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কোন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় নি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণেতা ড. বদর"দ্দীন উমর বলেন-'একটি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার অর্থ শুধু সর্বস্ড়রে ক্লাস বক্তৃতা বাংলায় দেওয়া অথবা সর্বস্ড়রে বিভিন্ন পরীক্ষা বাংলায় নেওয়া নয়। এর অর্থ সেই ভাষায়, প্রত্যেকটি বিষয়ে এ ক্ষেত্রে বাংলাভাষার মাধ্যমে সরাসরি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে পরিচিত হওয়া এবং তা আয়ত্ত করা। কিন্তু প্রথম থেকে এখন পর্যন্ড় বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর প্রত্যেকটি সরকার রাজনৈতিক ফায়দার জন্য বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করা ও সর্বক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে গেলেও তাদের কাছে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার অর্থ কার্যক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলার ক্লাস বক্তৃতা দেওয়া ও বাংলায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে হয় না।'

প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা শিক্ষাদান মূলত পাঠ্যবই, নোট ও গাইড বই নির্ভর। নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা শেখানোর জন্য যে উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারিত করা আছে এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার যেসব অর্জিতব্য যোগ্যতা ও ভাষা দক্ষতার কথা সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ড় করা আছে তার বিন্দুমাত্র সর্ম্পক নেই দেশের মাধ্যমিক স্ড়রে বাংলা ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতিতে। তাই মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা শিক্ষাদনের বর্তমান অবস্থা অনেকটা আ-কার যুক্ত 'দুরাবস্থা'র মতোই শোচনীয়।

তথ্যসূত্র:

১. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে ১৯৭৪

২. Report of the East Bengal Educational System Recoustruction Committee (মাওলানা আকরাম শিক্ষা খাঁ কমিটি রিপোর্ট নামে পরিচিতি), ১৯৫২

৩. School Education in Bengal–Government of Bengal, Education Department, 1937

৪. Report of the Commission on Students Problems and welfare(হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট), 1966

৫. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশনরূপে পরিচিত), ১৯৮৮

৬. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৭৬ (মুহাম্মদ শামস-উল-হক ও পরবর্তী সময়ে প্রফেসর জিল-ুর রহমান সিদ্দিকী কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন, ৭ খন্ডে প্রকাশিত)

৭. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৯৭ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যানসেলর, বিশ্ববিদ্যালয় মজুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো:শামসুল হক কমিটির রিপোর্ট)

৮. Report of the Martial Law Committee on Organisation set up phase III, Volume XIV, Part -1, Chapter XII - National Curriculum & Textbook Board , February 1984

৯. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কিত শিক্ষক নির্দেশিকা: বাংলা ভাষা- বহুনির্বাচনী এবং কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নমুনা (উত্তর সহ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা, জুন ২০০৫

১০. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি: মাধ্যমিক স্ড়র (৯ম-১০ম শ্রেণী)রিপোর্ট দ্বিতীয় খন্ড-জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৫

১১. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি: রিপোর্ট ২য় খন্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৭৭

১২. শিক্ষক নির্দেশিকা: মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য ও কবিতা: নবম-দশম শ্রেণী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৭

১৩. শিক্ষা ও শিক্ষা আন্দোলন: বদর"দ্দীন উমর, শ্রাবণ প্রকাশনী, ১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০১

ককবরক ভাষা ও সাহিত্য*

কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী**

'ককবরক' শব্দের অর্থ মানুষের ভাষা। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম কক বরক। ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় একে মুং বা ত্রিপুরা অথবা তিপরা বলেছেন। ভারতবর্ষের ভাষা বিষয়ে যাঁর অনুসন্ধিৎসু গবেষণা ও জরিপ প্রবাদতুল্য খ্যাতি পেয়েছে সেই পন্ডিত জর্জ গ্রিয়ার্সন এ ভাষাকে বলেছেন মুরুং। আর ইতিহাসবিদ হান্টার বলেছেন ম্রং। অন্যদিকে ত্রিপুরার রাজপরিবার যুগযুগ ধরে ককবরক ভাষাকে 'ত্রিপুরী' হিসেবে এর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চেয়েছেন। তবে বাস্তব হলো এই–আজ ভারতের অন্যতম রাজ্য ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা ভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ককবরক ভাষা স্বীকৃত। ককবরক ভাষা বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতেও প্রচলিত আছে বলে জানা যায়।

বাংলাভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজাদের নানা আনুকূল্যের কথা আমরা জানি। কিন্তু ককবরক ভাষা যে একটি সুশৃঙ্খল ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ ভাষা তা বাংলাদেশের অনেকের কাছে পরিজ্ঞাত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশ লাভ করুক- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের একটি অঙ্গীকার। সে আলোকে এবং বাংলা ভাষার পাশাপাশি এই 'অনাদৃত কুসুম' ককবরক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ককবরক ভাষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, পন্ডিত , গবেষক ও ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ককবরক ভাষা গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক ড. কুমুদ কুন্ডু চৌধুরীর '*ককবরক ভাষা ও সাহিত্য*' নিবন্ধটি প্রকাশ করা হলো। *- সম্পাদক।*

ককবরক ভাষার বংশ-পরিচয়

ককবরক ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) ভাষাবংশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। চীনা তিব্বতীয় ভাষাবংশের ঠিক নিচের সিঁড়িটা হচ্ছে তিব্বত বর্মীয় (Tibeto-Burman) আবার তিব্বত-ধর্মীয় উপভাষা বংশের কতকগুলো শাখা-প্রশাখা আছে। এই শাখা-প্রশাখার মধ্যে সব থেকে উলে- খযোগ্য ভাষা শাখা হলো বোডো-নাগা (Bodo-Naga) শাখা। আর ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাগুলো এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত। নিচে একটি বংশ-পীঠিকা মারফত ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা গেলো :

** ড. কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী – ককবরক ভাষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক। অধ্যাপক, কক বরক ভাষা কেন্দ্র, আগরতলা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য, ভারত।

চীনা-তিব্বতীয়
(Sino-Tibetan)

- **তিব্বত-বর্মীয়** (Tibeto-Burman)
  - ১) হিমালয় শাখা (Himalayan group)
  - ২) উত্তর-আসাম শাখা (North-Assam group)
  - ৩) তিব্বতীয় শাখা (Tibetan group)
  - ৪) আসাম-বার্মা শাখা (Assamese Burmese group)
- **শ্যাম-চীন** (Siames-Chinese)
  - থাই শাখা (Thai group)

আসাম বার্মা (বর্মীয়) শাখা
(Assam-Burmese group)

- ১) বোডো নাগা (Bodo-Naga)
- ২) মিকির (Mikir)
- ৩) বার্মা কুকীচীন শাখা (Burmese Kukichin group)
- ৪) মনিপুরী (Meithei)
- ৫) কুকী (Kuki)
- ৬) লুসাই (Lusai)
- ৭) মগ (মগ)
- ৮) চাকমা (মৃত) (Chakma extinct)

বোডো নাগা
(Bodo-Naga)

- ১) ককবরক (Kokborok)
- ২) দিমাছা (Dimasa)
- ৩) কোচ (Koch)
- ৪) মেচ (Mech)
- ৫) চুতিয়া (Chutiya)
- ৬) রাভা (Rabha)
- ৭) হাজং (Hajong)
- ৮) মোরান (Moran)
- ৯) বোডো (Bodo)
- ১০) নাগা (Naga)
- ১১) গারো (Garo)

ককবরক ও তার উপভাগসমূহ
(Kokborok and its dialects)

- পুরান ত্রিপুরী (Puran tripuri)
- রিয়াঙ (Reang)
- জমাতিয়া (Gamatia)
- নোয়াতিয়া (Noatia)
- মুরাছিঙ (Murasing)
- উছই (Uchhoi)
- কলই (Koloi)
- রূপিনী (Rupini)

ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাসমূহের সহাবস্থান

স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধায় উভয়ই ককবরক (ত্রিপুরী/ত্রিপুরা/টিপেরা/ত্রিপুরা) ও তার সহোদরা ভাষাগুলোকে বোডো-নাগা শাখার পরিবর্তে বোডো শাখার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁর- *Linguistic survey of India* গ্রন্থে বলেছেন, 'The Bara group, then comprises the language spoken by the Bara-fisa (i.e, the Mech and Kacharis) and the cognate language, spoken by the other tribes shown in the following table:

Tane Bara (Kachari and Mech)
Rabha
Lalung
Dima-sa (hills kachari)
Garo (or Mande)

Chutiya– To this list must be added one more name, Moran. This was the language of a tribe now completely Hinduised, living in Sibsagar and Lakhinpur.'

সুনীতি বাবুর মতে ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাগুলো যীশুখ্রীস্টের জন্মের কিছুকাল আগে থেকেই আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে সহাবস্থান করে আসছে। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থের 'Introduction' Chapter- এ মন্তব্য করেছেন এভাবে, 'The bodo sections of the Tibeto-Burman branch of the Tibeto-Chinese people (Bodo, MEC, KOC, Kacari, Rabha, Garo, Tipura) came to Assam and East-Bengal, and were spread all over East and North Bengal.' এবং এই সব তিব্বত-বর্মীয় জন গোষ্ঠী। আসাম ও পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশের সময়কাল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'The time of the Tebeto-Burman incursion in Assam and in East Bengal is not known, but it could not have been long before the beginning of the christian era, at the earliest.'

এখন ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাগুলোর আদি বাসস্থান কোথায় ছিলো সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে জানা যায় যে, এসব তিব্বত বর্মীয় জনগোষ্ঠী মহাচীনের হোয়াং হো নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে এসে আসাম ও পূর্ববঙ্গে সহাবস্থান করেছেন। এই সম্পর্কে ভাষাবিদ তারাপোরওয়ালা (Irach Tehangir Sorabgi Taraporewala) তাঁর 'Elements of the Science of Language' গ্রন্থে বলেছেন, 'It seens that the original home of these languages was in South-West China near the head-waters of the Yang-Tse-kiang and the Hwang-ho. From there they went down the courses these two great rivers into China proper and down the Brahamaputra....'। এখন দেখা যাচ্ছে, ভাষাবিদ তারাপোরওয়ালার মন্তব্যের সঙ্গে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ-এর পর্যবেক্ষণের মিল আছে। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মণের আতিথ্যে হিউয়েন সাঙ বেশ কিছুকাল কামরূপ ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন এবং তিব্বত-বর্মীয় উপজাতিদের সংস্পর্শে আসেন এবং তিনি এইসব উপজাতিদের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের মন উপজাতিদের মিল দেখতে পেয়েছেন। এই তথ্য জানা যায় ভাষাচার্য সুনীতি

কুমারের ODBL গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, 'Hiuen Thsang remarked that the tribes living in the frontiers of Kam-rup were akin to the main tribes of South-Western China, a wild Tibeto-Chines People.' কাজেই সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাগুলোর জনগোষ্ঠী গারো, বোডো, দিমাছা, কোচ, মেচ, চুতিয়া, হাজঙ, লীলুভ, রাভা, মোরান প্রভৃতি যীশুখ্রীস্টের জন্মকালের কিছুকাল পূর্ব থেকেই বৃহত্তর আসাম, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে বসবাস করে আসছেন এবং চীনা পরিব্রাজক যাঁদের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের চীনা-তিব্বতীয় মন্ উপজাতীদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

ককবরক ও দিমাছা ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য

ককরবকে যে সহোদরা ভাষাগুলো আছে, তার মধ্যে বোডো ও দিমা কাছাড়ের দিমাছো ভাষার সঙ্গে তার তাত্ত্বিক সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তবে দিমাছার সঙ্গে ককবরকের ভাষাগত আত্মীয়তা সবথেকে কাছাকাছি । এক সময় ককবরকের সহোদরা ভাষাগুলো একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং ওইসব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের পৃথক পৃথক ভাষা-রাজ্য স্থাপন করে। এবং এইভাবে বোডো ভাষারাজ্য ও দিমাছা ভাষা-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার মনে হয় ককবরক দিমাছা ভাষা থেকেই জন্মলাভ করেছে। এখন ককবরক ও দিমাছা ভাষার মধ্যে কিছু শব্দগত সাদৃশ্য দেখানো যাক।

১. সমোচ্চারিত ও সমর্থক ককবরক ও দিমাছা শব্দ

ককবরক	দিমাছা	বাঙলা অর্থ	ককবরক	দিমাছা	বাঙলা অর্থ
আঙ	আঙ	আমি	নূঙ	নূঙ	তুমি
আনি	আনি	আমার	নিনি	নিনি	তোমার
মা	মা	মাতা	নূমা	নূমা	তোমার মা
বুমা	বুমা	তার মা	যগ	যগ	বাবা
নূফা	নূফা	তোমার বাবা	বুফা	বুফা	তার বাবা
মাই	মাই	ধান	মিছিপ	মিছিপ	মহিষ

২. সামান্য পার্থক্যযুক্ত সমার্থক ককবরক ও দিমাছা শব্দ

ককবরক	দিমাছা	বাঙলা অর্থ	ককবরক	দিমাছা	বাঙলা অর্থ
ব	ব(ঃ)	সে	চূঙ	মূঙ	আমরা
বিনি	বনি	তার	চিনি	জিনি	আমাদের
আমা	আমাই	আমার মা	মাইরঁঙ	মাইরঙ	চাউল
আ	না	মাছ	আ-ন	আঙখে	আমাকে
ন-ন	নূঙখে	তোমাকে	ব-ন	বখে	তাকে
চূঙ-ন	জূঙখে	আমাদিগকে	মাই	মুখাম	ভাত

থক	থাউ	তেল	ছম	ছেম	নুন
আচাই	হাজাই	জন্মগ্রহণ করা	কুফুর	গুফু(ঃ)	সাদা
থূই	থি	রক্ত			

ককবরক ও দিমাছার মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য এইরকম- ককবরকের ক, চ, ত, প স্থলে দিমাছায় যথাক্রমে গ, জ এবং দ / ড এবং ব হয়।

বোড়ো ভাষা ও দিমাছা ভাষার সঙ্গে ককবরক (ত্রিপুরী/তিপ্‌রা/টিপ্‌রা/টিপেরা/তিপুরা) ভাষার মিল এত বেশি যে ককবরক বোড়ো না দিমাছা থেকে জন্ম নিয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সব শেষে বিশেষ একটি তথ্যের কারণে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কাছাড়ের দিমাছা থেকে ত্রিপুরী (ককবরক) ভাষার জন্ম হয়েছে। যে বিশেষ তথ্যের কথা আমি উলে- খ করছি, তা হলো এক সময় কাছাড়ের দিমাছা রাজার ছোটো ছেলে অর্থাৎ কনিষ্ঠ রাজপুত্র পারিবারিক কলহের কারণে পার্বত্য ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং সেখানে হালাম রাজাদের পরাস্ড় করে চিরস্থায়ীভাবে তার পরিবার-পরিজন ও লোক-লস্কর নিয়ে রাজত্ব স্থাপন করেন। এবং তাদের আনীত দিমাছা ভাষা ত্রিপুরায় এসে ত্রিপুরী নাম লাভ করে এবং আধুনিককালে তা ককবরকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর যা থেকে ককবরকের ৮টি উপভাষা- পুরান ত্রিপুরী, রিয়াঙ, জমাতিয়া, কলই, নোয়াতিয়া, মুরাছি, উলছই (উছই) ও রূপিনী জন্ম নেয়।

আমার দেওয়া এই তথ্যের সঙ্গে কৈলাসচন্দ্র সিংহের *রাজমালা* বা *ত্রিপুরার ইতিহাস* গ্রন্থে বিধৃত তথ্যের হুবহু মিল আছে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে বলেছেন, 'ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কাছাড়ের নির্বাণপ্রাপ্ত রাজবংশ ও ত্রিপুরার রাজবংশ এক মূল হইতে উদ্ভূত।'

এখন প্রশ্ন হলো, দিমাছা রাজপুত্র কোন সময়ে এসে ত্রিপুরা রাজ্য হালাম রাজাদের কাছ থেকে দখল করেছিলেন, সেই সময়কাল বের করা। আমার ধারণা, দিমাছা রাজপুত্র যে-সময় থেকে ত্রিপুরায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, ঠিক তখন থেকেই ত্রিপুরাদের সূচনা হয়েছে এবং তখন থেকেই ত্রিপুরায় আনীত দিমাছা ভাষার নাম হয়েছে ত্রিপুরী অর্থাৎ ত্রিপুরার ভাষা। অর্থাৎ ত্রিপুরাব্দ এবং ত্রিপুরী (ককবরক) ভাষার বয়সকাল একই। এখন ১৪১৫ ত্রিপুরাব্দ চলছে, আর তাই ত্রিপুরার ককবরক ভাষার বয়সও ১৪১৫ বছর। আমার এই তথ্যের সঙ্গে কেউ সহমত পোষণ নাও করতে পারেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের 'Glotto-Chronology'র আলোকে বিশেষ কোনো ভাষার বয়সকাল নির্ণয় করা যেতে পারে। আমি ইতিপূর্বে আমার লেখা '*তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোকে বোড়ো ও ককবরক*' প্রবন্ধে বলেছিলাম, 'Glotto-Chronology'র আলোকে জানা যায় যে, যদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি ভাষার মধ্যে মূল শব্দের শতকরা ৬৬ ভাগ মিল পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে, ওই দুটি ভাষা এক হাজার বছর পূর্বে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর যদি এই মিল শতকরা ৪৪ ভাগ হয়, তাহলে বুঝতে হবে, দু'হাজার বছর পূর্বে ভাষা দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত আমেরিকান ভাষাবিদ H. A. Gleason Jn. তাঁর বিখ্যাত An introduction to Descriptive Linguistics গ্রন্থের ৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'If 66 percent of the basic morpheme stock seems to be cognate in two languages, we may assume that they have been separate for 1000 years. If 44 percent is cognate, 2000 years is the most probable period of separation.' ককবরক ও দিমাছা ভাষার তুলনামূলক গবেষণা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এই দুটি ভাষার মূল শব্দভা ারে শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ মিল রয়েছে। এই 'Glotto-Chronology'র আলোকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ১২০০ বছর পূর্বে দিমাছা

ভাষা থেকে ককবরক বেরিয়ে এসে একটি স্বতন্ত্র ভাষার রূপ নিয়েছে (আমার 'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য' পুস্ড়ক থেকে এই তথ্য এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে)।

ককবরক বর্ণমালা

ত্রিপুরার 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ড় ককবরক উপভাষাগুলোর একটি বিজ্ঞানসম্মত লেখ্যরূপ দেয়ার জন্যে সচেষ্ট থাকেন। ওই সংস্থার আমন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative philology) বিভাগের অধ্যাপক ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে একটি অলিখিত ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণের গবেষণার কাজ শুর" হয়। ড. চ্যাটার্জী ভাষাতত্ত্বের তাঁর দুই ছাত্র কুমুদ কু" চৌধুরী ও শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যের সাহায্যে ওই ঐতিহাসিক গবেষণার কাজ পরিচালনা করেন। ১৯৭২ সালে ককবরক ভাষা গবেষণা সংক্রান্ড় '*ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ*' বইখানি ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় যে, ৬টি স্বরবর্ণ ও ২১টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে ককবরক বর্ণমালা গঠিত হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ :

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই
উ	ঊ(*)	এ

*'ঊ' এই ধ্বনিটি ককবরকের একটি কেন্দ্রীয় স্বরবর্ণ। যার সঠিক প্রতীকগোত্র বাংলা বর্ণমালায় নেই। তা সত্ত্বেও বাংলা বর্ণমালা 'ঊ' প্রতীককেও ব্যবহার করে ধ্বনিটির দৃশ্যরূপ দেয়া হয়েছে। যেমন তূই (জল), নূঙ (পান করা), চূঙ (প্রজ্জ্বলিত হওয়া), রূঙ (জানা)।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ
চ	ছ	জ
ত	থ	দ
প	ফ	ব
ঙ	ন	ম
ঁ	য়	ব
র	ল	হ

ককবরক একটি সুরধর্মী ভাষা (tonal language)

Acoustic phonetics-এর আলোকে বিশে- ষণ করে দেখা গেছে ককবরক একটি সুরধর্মী ভাষা। সুরের তরঙ্গক্ষেপের পার্থক্যের জন্যে ককবরক শব্দের অর্থ পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন,

এক. ১) কক অর্থ ভাষা

	২) কক	অর্থ	গুলিকরা
	৩. কক	অর্থ	স্খলিত হওয়া
	৪. কক	অর্থ	একপ্রকার ফল
দুই	১) ছু	অর্থ	ধোওয়া
	২) ছু	অর্থ	পরিমাপ করা
	৩) ছু	অর্থ	পরিশোধ করা
	৪) ছু	অর্থ	আঘাত করা
	৫) ছু	অর্থ	চুম্বন করা (মতম ছু)

ককবরক রূপতত্ত্ব

এক : ককবরকে বচনের ব্যবহার

ককবরকে এক বচন থেকে বহুবচন করতে হলে 'ছঙ' এবং 'রগ' এই দুটি বহুবচনবোধক প্রত্যের ব্যবহার করা হয়। যেমন :

আমা (আমার মা) + ছঙ	= আমাছঙ - আমার মা ও অন্যান্য
বুমা (তার মা) + ছঙ	= বুমাচঙ - তার মা ও অন্যান্য
কিচিঙ (পুর ষবন্ধু) + ছঙ	= কিচিঙছঙ - পুর ষবন্ধুরা
মারে (বান্ধবী) + ছঙ	= মারেছঙ - বান্ধবীরা
বূরূই (স্ত্রীলোক) + রগ	= বূরূইরগ - স্ত্রীলোকেরা
চূলা (পুর ষলোক) + রগ	= চূলারগ - পুর ষলোকেরা

দুই : ককবরকে লিঙ্গের ব্যবহার

ককবরক ভাষার পুর ষবোধক শব্দের পাশে সাধারণত 'মূক' এই স্ত্রী লিঙ্গবোধক প্রত্যয়টি ব্যবহার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :

কূরা (শ্বশুর) + মূক	= কূরামূক - শাশুড়ী
তক (মোরখ) + মূক	= তকমূক - মুরগী
বাক (উ আক-শূকর) + মূক	= বাকমূক - শূকরী
করাই (ঘোড়া) + কূক	= করাইমূক - মাদী ঘোড়া

তিন : ককবরকে বিভক্তির ব্যবহার

ককবরকে বিভক্তি হলো ৭টি। যেমন :

কর্তৃকারকে	০	বিভক্তি	- বুয়াঙ (গাছ)
কর্মকারকে	ন	বিভক্তি	- বুফাউ-ন (গাছকে)

করণকারকে	বাই	বিভক্তি	- বুফাঙ - বাই (গাছ দিয়ে)
সম্প্রদান কারকে	ন	বিভক্তি	- বুফাঙ-ন (গাছকে
অপাদান কারকে	নি	বিভক্তি	- বুফাঙ-নি (গাছ থেকে)
সম্বন্ধপদে	নি	বিভক্তি	- বুফাঙ-নি (গাছের)
অধিকরণ কারকে	অ/গ	বিভক্তি	- বুফাঙ-অ (গাছে)

চার : ককবরক বাক্য বিন্যাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

ককবরক বাক্য বিন্যাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। যেমন :

চূলা (ছেলে) কাহাম (ভালো)	- ছেলে ভালো (ভালো ছেলে)
বুফাঙ (গাছ) কলক (লম্বা)	- গাছ লম্বা (লম্বা গাছ)
নক (ঘর) কূখাম (পোড়া)	- ঘরপোড়া (পোড়াঘর)
মুই (তরকারি) কথক (সুস্বাদু)	- তরকারি সুস্বাদু (সুস্বাদু তরকারি)

ককবরক সাহিত্য

ককবরক সাহিত্যের প্রথম বই ককবরক ভাষায় লেখা মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্যের জীবনী। এই জীবনী গ্রন্থ লেখা হয় ১৭০৩ সালে। লেখকের নাম দুর্গামণি ত্রিপুরা। তারপর প্রায় দুই শতাব্দী পরে ১৮৯৭ সালে কাজী দৌলত আহম্মদ লেখেন তাঁর *কক-বরমা* (ককবরক ব্যাকরণ) ও *ককমাঃ কালাই* গ্রন্থদ্বয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩০৭ (১৯০০) সালে বই দু'খানি প্রকাশ করেন। 'ককমা : কালাই' বইয়ে ককবরক ভাষায় *বলঙ* (বন) নামে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। কাজী দৌলত আহম্মদের সমসাময়িককালে ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা প্রকাশ করেন *ককবরকমা* (১৯০০), *ত্রৈপুর ভাষাভিধান* (১৯১৭) এবং ত্রিপুরা লোকগাথার সংকলন ও *ত্রৈপুর কথামালা* (১৯১৯)।

১৯৫৪ সালে ককবরক ভাষায় *কৃতাল-কথমা* (নব সাহিত্য) নামে প্রথম দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ককবরক ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক সুধন্বা দেববর্মা ছিলেন এই সাহিত্যপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিন বছর ধরে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে বহু লেখক আত্মপ্রকাশ করেন।

ককবরক কবিতা

ককবরক সাহিত্যভা ার ককবরক কবিতায় ভরপুর। ধারাবাহিকভাবে প্রায় ১০০ বছর ধরে ককবরক কবিতা লেখা হচ্ছে। ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে ককবরক কবিতা লেখায় জোয়ার আসে। আধুনিক ককবরক কবিদের মধ্যে নন্দ কুমার দেববর্মা, শ্যামলাল দেববর্মা, বিকাশরায় দেববর্মা, চন্দ্রকান্ড়মুড়াসিঙ-এর নাম উলে- খ্য। কবি চন্ডকান্ড়মুড়াসিঙ ইতিমধ্যে তাঁর ককবরক কবিতা লেখার স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকারের বিশেষ ভাষা সম্মান পুরস্কার লাভ করেছেন দিল-ীর সাহিত্য আকাদেমি মারফত।

ককবরক নাটক

ককবরকের নাট্যচর্চা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার তুলনায় অনেক বেশি। ইতিমধ্যে অনেক নাটক লেখা ও

প্রকাশিত হয়েছে ককবরক ভাষায়। আগরতলায় নিয়মিতভাবে ককবরক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়ে থাকে। নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে নন্দকুমার দেববর্মা ও র্ন্হি দেববর্মার নাম বিশেষ উলে- খ্য।

ককবরক উপন্যাস

ককবরক উপন্যাস কিছুটা কম লেখা হলেও তার মান খুবই উন্নত। সুধন্বা দেববর্মার *হাচুক খুরিঅ* (পাহাড়ের কোলে) চার খ্ন্ লেখা ককবরক ভাষার প্রথম উপন্যাস। এই জনপ্রিয় উপন্যাসখানির বাংলা অনুবাদ বাঙালি পাঠকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ককবরকের দ্বিতীয় উপন্যাস লেখেন শ্যামলাল দেববর্মা। উপন্যাসের নাম *খঙ* (গ্ন্)। উপন্যাসখানির বাংলা অনুবাদ করেছেন আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জন কু্ন্ চৌধুরী। দু'বছর আগে সাড়া জাগানো উপন্যাস লিখেছেন ডা. অতুল দেববর্মা। তাঁর উপন্যাসের নাম *১৯৮০*। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় উপজাতি ও বাঙালিদের মধ্যে যে ভয়াবহ হাতিদাঙ্গা ঘটে তারই প্রেক্ষাপটে লেখা ৬০০ পাতার সুবৃহৎ এই ককবরক উপন্যাস। লেখক ২০০৬ আগরতলা বইমেলায় তাঁর উপন্যাসের জন্যে ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ বইয়ের জন্য।

ককবরক ছোটগল্প

ককবরক ছোটগল্পও পিছিয়ে নেই। গল্পকারদের মধ্যে শ্যামলাল দেববর্মা, হরিপদ দেববর্মা, সুনীল দেববর্মা খুবই জনপ্রিয়। হরিপদ দেববর্মার '*জালাই তকপুপু*' গল্পসংকলন ককবরক কথা সাহিত্যের মান বাড়িয়ে দিয়েছে। নগেন্দ্র জমাতিয়াকে ককবরক ভাষার প্রথম ছোট গল্পকার হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তাঁর লেখা '*হাথাই*' (পাহাড়) গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় সত্তরের দশকের শেষভাগে। ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পটভূমিকায় তাঁর লেখা '*আথুক রাই*' ছোট গল্পটি একটি বিশ্বমানের ছোট গল্প।

ককবরক প্রবন্ধ

ককবরক প্রবন্ধকারদের মধ্যে যঁদের নাম করতে হয় তারা হলেন দশরথ দেববর্মা, সুধন্ব দেববর্মা, বংশী ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, নিরঞ্জন দেববর্মা, এন সি দেববর্মা (নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা), নরেশচন্দ্র দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া প্রমুখ। ২০০৬-এর আগরতলা বইমেলায় নরেশচন্দ্র দেববর্মার '*জরানি মূখাঙ*' (সময়ের মুখ) নামে একখানি প্রবন্ধ সংকলন বেরিয়েছে। বলা যেতে পারে সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের ভাষা ককবরক সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। এই ভাষাভাষী জনগণ ককবরক ভাষাকে ভারতের সংবিধানের ৮ম তফছিলে অন্ড়র্ভুক্ত করার জন্যে সোচ্চার দাবি তুলেছেন।

ককবরক ভাষার হালফিল খবর

ত্রিপুরার ককবরক জনগোষ্ঠীর দাবিকে সম্মান জানাতে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ককবরক ভাষাকে ১৯৭৯ সালে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ১৯৮১ সালে এই ভাষাতে প্রাথমিক স্ড়রে শিক্ষার মাধ্যম- 'medium of instruction' হিসেবে চালু করেছেন এবং ধাপে ধাপে সেকেন্ডারি এডুকেশনে এই ভাষা চালু করার প্রচেষ্টা চলছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে Centre for tribal languages-এর অধীনে ককবরক ভাষায় এক বছরের একটি ডিপে-ামা কোর্স খোলা হয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে UGC (University Grants Commission) দু'বছর আগে ককবরক লেকচারার-এর একটি পদ সৃষ্টি করেছেন। এই ভাবে ককবরক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এগিয়ে চলেছে।

ককবরক লিপি বিতর্ক

ককবরক বর্তমানে সরকারিভাবে বাংলা হরফে লেখা হচ্ছে। কিন্তু ককবরক ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ রোমান হরফের দাবি তুলেছেন। এবং এর জন্যে Movement for Kokborok নামে একটি সংগঠন জোরদার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলা হরফের পাশাপাশি রোমান হরফেও এখন ককবরক লেখা হচ্ছে। ককবরক সাহিত্য এখন বাংলা ও রোমান হরফে সমান্তরালভাবে লিখিতরূপ নিয়েছে। তবে ককবরকের পক্ষে বাংলা বা রোমান কোন হরফ সঠিক তার সীমাংসা এখনও হয় নি। ত্রিপুরা সরকার এই হরফ বিতর্ক মীমাংসার ভার এখন ভাষা কমিশনের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার পটভূমি

মুহাম্মদ আলী*

বিগত তিন শতাব্দীতে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ-ছয় বছরে পৃথিবীতে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বেশির ভাগ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার কোন কোন ক্ষেত্রে বৈপ- বিক পরিবর্তন এসেছে এবং এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। এ কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার অবস্থান এখন এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রণালয়ের নাম হয়েছে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর অনেক দেশেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য প্রকৃতির বহুবিধ অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। বিজ্ঞান শিক্ষার অপর উদ্দেশ্য- এই লব্ধ জ্ঞানকে মানবসমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে কাজে লাগানো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুঃখের বিষয়- বাংলাদেশে সাধারণভাবে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা যেমন অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনিভাবে কোন দৃঢ় ঐতিহ্য আজও আমরা গড়ে তুলতে পারি নি।

চৌদ্দ কোটি মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব বিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতির যুগোপযোগী পরিবর্তন অত্যন্তজরুরি এবং একান্তভাবে কাম্য।

এক সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন এই ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাও স্বাধীন দেশের মত উপযোগী করে গড়েতোলা হয় নি। তাই বিজ্ঞান শিক্ষার বিরাজমান এ পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে সাধারণ মানবিক শিক্ষাই ছিল তাদের জন্য যথেষ্ট।

১৯৭১ সালে এক দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর বাংলাদেশের স্বাধীনতাসূর্য উদিত হল। সে-সময়ে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন ছিল দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমগ্র জনসাধারণের জন্য অন্তত কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করা। তেমন এক পরিস্থিতিতে দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, নির্মাণ, যোগাযোগ, পরিবহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন সাধনই হয়ে উঠল অধিকতর জরুরি।

স্বাধীনতাউত্তর যে-কোন দেশের দ্রুত উন্নয়নের উপরিউক্ত প্রত্যাশা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। যে-কোন দেশে শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হলে সে দুর্বলতা প্রতিফলিত হয় এর সামাজিক, রাজনৈতিক,

---

* মুহাম্মদ আলী – সাবেক সদস্য (শিক্ষাক্রম) এনসিটিবি এবং বর্তমানে শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শক

অর্থনৈতিক-সহ সকল ক্ষেত্রে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যেই অনুভূত হল যে, দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যাপক আয়োজন ব্যতিরেকে অপর কোন উন্নয়ন সার্থক হতে পারে না। আরও অনুভূত হল এ দেশের আগামী দিনের নাগরিক ও সৃজনশীল তরুণ সমাজের মধ্যে উন্নয়নমুখী মনোভঙ্গি গড়ে তোলা এবং দেশের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন কোন উলে-খযোগ্য স্থান ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের কেবল চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে 'প্রকৃতিপাঠ' নামক বিষয়ে বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হত। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধের প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৫১ সালে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে 'সাধারণ বিজ্ঞান' নামে একটি বিষয় প্রবর্তন করা হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে তখন বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক ধারণা পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অল্পসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তখন অবশ্য অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মৌলিক বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক দশকব্যাপী এই ব্যবস্থা চালু ছিল। বিদ্যালয়-স্তরের শেষ পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় বিজ্ঞান বিষয়টি কেবল নাম মাত্রই পড়ানো হতো।

বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৬০ সালের ২৪ জুন মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম কমিটি গঠন করেন। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের (শরীফ কমিশন) সুপারিশের আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা এবং সমগ্র পাকিস্তানে শিক্ষার সমমান বজায় রাখাই ছিল উপরিউক্ত কমিটির ওপর অর্পিত প্রধান দুটি দায়িত্ব।

১৯৬০ সালে ১২ জুলাই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাক্রম কমিটি এবং গ্রীষ্মকালীন সেমিনার সংক্রান্ত এক যৌথ সভা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবটাবাদ রেলওয়ে পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ক তাঁর ভাষণে দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর চাহিদা পূরণকল্পে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এর আগে ১৯৬০ সালের ৭ জুলাই তদানীন্তন শিক্ষা সচিব ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এস, এম, শরীফ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা করেন। বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা (Diversification of Courses) ছিল সেই 'জাতীয় শিক্ষা কমিশনের' অন্যতম মূল সুপারিশ।

নবম-দশম শ্রেণীতে তৎকালীন বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নোক্ত পাঁচটি শাখা প্রবর্তন করা হয়:

ক. মানবিক শাখা (Humanities Group)

খ. বিজ্ঞান শাখা (Science Group)

গ. বাণিজ্য শাখা (Commerce Group)

ঘ. শিল্পকলা শাখা (Industrial Group)

ঙ. গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা (Home Economics Group)

১. আবশ্যিক বিষয়সমূহ: উপরিউক্ত বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় মোট ১০টি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সাধারণ বিজ্ঞান ছিল একটি। অন্যান্য বিষয় ছিল: বাংলা, বাংলা (বিকল্প সহজ পাঠ), উর্দু, উর্দু (বিকল্প সহজ পাঠ), সিন্ধি, ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ গণিত ও শারীরিক শিক্ষা।

২. নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ:

ক. মানবিক শাখা: মানবিক শাখায় মোট ৩৩টি বিষয় ছিল নৈর্বাচনিক।

খ. বিজ্ঞান শাখা: বিজ্ঞান শাখায় মোট ৭টি নৈর্বাচনিক বিষয় ছিল। বিষয়গুলো ছিল: গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, জ্যামিতি ও টেকনিক্যাল ড্রয়িং এবং ভূগোল।

গ. বাণিজ্য শাখা : বাণিজ্য শাখায় মোট নৈর্বাচনিক বিষয় ছিল চারটি।

ঘ. শিল্পকলা শাখা : এ শাখায় নৈর্বাচনিক বিষয় ছিল ১৫টি। গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ধাতব পদার্থের কাজ, কাঠের কাজ, ফলিত বিদ্যুৎ (Applied Electricity), বাসন- কোসন ও তৈজসপত্র বিজ্ঞান (Pottery and Ceramics), চামড়ার কাজ, কার ও চার কলা, বয়নশিল্প, ইমারত নির্মাণ, জ্যামিতিক ও টেকনিক্যাল ড্রয়িং, বাঁশ ও বেতের কাজ, দর্জিবিজ্ঞান, কনফেশনারি ও বেকারি (Confectionery and Bakery)।

ঙ. গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা : এ শাখার বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ:

রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, খাদ্য ও পরিপুষ্টি, বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, পারিবারিক জীবন (Family Living)।

চ. কৃষি শাখা : এ শাখায় ৫টি বিষয় গুচ্ছ ছিল-

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, কৃষি ও মৃত্তিকাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, পশুপালন, ফলবিজ্ঞান, বাগানবিজ্ঞান, মৎস্যচাষ ও গণিত।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (Lower Secondary Stage): ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম

১. আবশ্যিক বিষয়সমূহ: এ স্তরের বিষয় / বিষয় গুচ্ছ ছিল ২৬টি। এর মধ্যে প্রথম ১১টি বিষয় ছিল নিম্নরূপ-

বাংলা, বাংলা বিকল্প সহজপাঠ, উর্দু, উর্দু বিকল্প সহজপাঠ, সিন্ধি (কেবল সিন্ধু প্রদেশে শেখার মাধ্যম হিসেবে), ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ধর্মশিক্ষা (ইসলামিক স্টাডিজ), শারীরিক শিক্ষা। এ স্তরে ১২নং বিষয় গুচ্ছ চার ও কার শিল্প পরিচিতির আওতায় বিষয় সংখ্যা ছিল ১১টি-[চিত্রকলা (Art), কাদামাটির মডেল তৈরি, পুতুল বানানো (Toy Making), ঝুড়ি তৈরি (Basketry), বাসন-কোসন তৈরি (Pottery), বস্ত্র মুদ্রণ (Fabric Printing), চামড়ার কাজ, পাপেট তৈরি (Puppetry), পুস্তক বাঁধাই, বয়ন শিল্প (Weaving), বাঁশ ও বেতের কাজ।

২. নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ: ১৩নং বিষয় গুচ্ছ- ব্যবহারিক কলা পরিচিতির (Pratical Art –Introduction) আওতায় বিষয়সংখ্যা ছিল পাঁচটি– কাঠের কাজ, ধাতব পদার্থের কাজ, ফলিত বিদ্যুৎ, কৃষি ও বাগান বিজ্ঞান এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি। ১৪-২৬ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরে ১৩টি বিষয়ের নাম ছিল নিম্নরূপ:

আরবি, বাংলা, গুজরাটি, পালি, পাঞ্জাবি, পশ্তু, ফারসি, সংস্কৃত, সিন্ধি, উর্দু, চিত্রকলা (Art), নৃত্য ও

সংগীত।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সকল স্তরেই শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে যায়। তেমনি বেড়ে যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শেখার আগ্রহ ও প্রস্তুতি। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অপরিবর্তিত থেকে যায়।

১৩৭৯ সনের ১১ শ্রাবণ (১৯৭২ সালের ১২ জুলাই) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনই ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বও কমিশনটির উদ্বোধন করেন।

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত এ শিক্ষা কমিশনের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয় বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে আমাদের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক সেকেলে হয়ে পড়েছে। আমাদের বিজ্ঞানের কোর্সে নতুন ভাবধারা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। মাধ্যমিক ও তদুর্ধ স্তরে বিজ্ঞান পাঠ্যসূচি বিশেষভাবে উন্নীত করতে হবে যাতে অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর উন্নত দেশের মানের সমকক্ষতা অর্জন করা যায় (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৯৬:১১২)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রেজুলিউশন নং শা-১/৫৬০ শিক্ষা, তারিখ ২৫/১০/১৯৭৫ এর মাধ্যমে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সংশিষ্ট প্রস্তাবাবলি ও সুপারিশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশেষণের বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর আবুল ফজল ৪ মার্চ, ১৯৭৬ তারিখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন করেন এবং এর দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

ঐদিন বিকাল সাড়ে চারটায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সা'দত মোহাম্মদ সায়েম বঙ্গভবনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে পাঠ্যসূচি প্রণয়নে যে-সকল জটিল সমস্যা ছিল সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রথম দফায় যে-শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয় তাতে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার সাথে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্যের সাথে পরিচিতি, যথোপযুক্ত মনোভঙ্গি সৃষ্টি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় উপকরণাদি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তবে বাইরের পরিবেশ সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ বা পরীক্ষাগারের বিকল্প না হয়ে হয় পরিপূরক। উপরিউক্ত শিক্ষাক্রমের চাহিদা মোতাবেক কথা ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশকে হতে হবে পর্যবেক্ষণের প্রধান অঙ্গন। মাধ্যমিক স্তরের জন্য অবশ্য পরিবেশের বহুবিধ উপকরণ শ্রেণীকক্ষের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করার বিষয়টি প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও এর বাস্তবায়ন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির নির্ধারিত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

ক. নানা প্রাকৃতিক ঘটনা এবং চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি ;

খ. চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ- দক্ষতা গড়ে তোলা ;

গ. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের দক্ষতা অর্জন ;

ঘ. যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা;

ঙ. পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ও অন্যদের জীবনমানের উন্নয়নে সহায়তা দান ;

চ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে তোলা ;

ছ. বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন ;

জ. কিছুটা বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টি- যাতে বিদ্যালয় ত্যাগ করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কোন উৎপাদনশীল পেশা বেছে নিতে পারে ;

ঝ. শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য বাঞ্ছিত মূল্যবোধ গড়ে তোলা ;

নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বহুবিধ তথ্য বা মুখস্থ বিদ্যার ওপর গুরুত্ব কমিয়ে এ ধরনের তথ্য ও তত্ত্বকে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানকে পৃথক বিষয় হিসেবে বিবেচনা না করে *পরিবেশ পরিচিতি* অংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। পরিবেশ পরিচিতি সমন্বিত শিক্ষাক্রমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের নানা মৌলিক বিষয়বস্তু এবং ধারণাকে এমনভাবে সমন্বিত করা হয় যে, শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পরিবেশ এবং পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সাথে কিছুটা হলেও পরিচয় লাভ করে। এ সবের ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাদের পরিবেশ এবং পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সাথে পরিচিত হওয়ার এবং তেমন ধরনের সকল সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাধান করার উপযোগী মনোভঙ্গি ও দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরে লব্ধ অভিজ্ঞতার আরও বিস্তৃতি ঘটানোর সুযোগও রাখা হয়। এ কারণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি মূল বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে চর্চা করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন

১৯৭৫ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির প্রাথমিক স্তরের বিস্তারিত পাঠ্যসূচি সংবলিত রিপোর্ট ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। সরকার ১৯৭৭ সালে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তনেন এবং সেই সিদ্ধান্তঅনুসারে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী লিখিত নতুন পাঠ্যপুস্তক ১৯৭৮ সালে প্রথম তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ১৯৭৯ সালে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবর্তন করা হয়।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের জন্য নতুন পাঠ্যসূচি ১৯৭৭ সালে পেশ করা হয়, তবে সরকার তা বাস্তবায়ন শুরু করেন ১৯৮০ সাল থেকে। ষষ্ঠ শ্রেণীর বেশিরভাগ নতুন পাঠ্যপুস্তক ১৯৮০ সাল থেকে প্রবর্তণ করা হলেও বিজ্ঞান এবং ধর্মশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয় ১৯৮১ সাল থেকে। ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে যথারীতি

সকল নতুন পাঠ্যপুস্ড়ক ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে প্রবর্তন করা হয়। ব্যতিক্রম ঘটে ৮ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে ৮ম শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্ড়কের প্রবর্তন এক বছর বিলম্বিত হয় অর্থাৎ তা প্রবর্তন করা হয় ১৯৮৩ সালে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে নবম-দশম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলোকে সমন্বিত করে দুই পত্রের (ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান) সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। প্রথম পত্রে ছিল বিজ্ঞানের প্রকৃতি, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় পত্রে ছিল উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ, জনসংখ্যা শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি।

নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের এই নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ১৯৮৩ প্রবর্তন করা হয়। তবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধানত বিজ্ঞানের শিক্ষকের স্বল্পতা এবং বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার উপযোগী উপকরণের অভাবজনিত কারণে এ পাঠ্যসূচি সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক না করে নৈর্বাচনিক করা হয়। একই সাথে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্বেকার সাধারণ বিজ্ঞান ও নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। এ অবস্থা ১৯৯৫ সাল পর্যন্ড়নবম শ্রেণীতে বলবৎ ছিল।

বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও প্রক্রিয়াসমূহ

বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা কয়েকটি মানসিক দক্ষতা ও প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গঠন করা হয়। এ ধরনের বৈজ্ঞানিক উপায়গুলো (Tools) অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। নিচে ষোলটি বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও প্রক্রিয়ার নাম সন্নিবেশিত হল :

১. পর্যবেক্ষণ (Observation)
২. শ্রেণীকরণ বা শ্রেণী বিভাগ(Classification)
৩. লিপিবদ্ধকরণ ও যোগাযোগ সাধন (Rewriting and Communication)
৪. সংখ্যার ব্যবহার (Use of Numbers)
৫. মোটামুটি হিসাব করা (Estimation)
৬. পরিমাপ (Measurement)
৭. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (Asking Question)
৮. অনুসিদ্ধান্ড়করণ (Formulating Hypothesis)
৯. ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction)
১০. অনুমিতি (Inference)
১১. পরীক্ষণ কাজ (Experimenting)
১২. 'চল' এর নিয়ন্ত্রণ বা কৌশলগত পরিচালনা (Controlling or Manipulating Variables)
১৩. কার্যোপযোগী সংজ্ঞা তৈরি (Making operational Definition)

১৪. ‘মানসিক মডেল’ তৈরি (Formation of Mental Models)

১৫. উপাত্ত বিশে- ষণ (Interpreting Data)

১৬. ব্যবহারিক কৌশলগত দক্ষতা (Manipulative Skill)

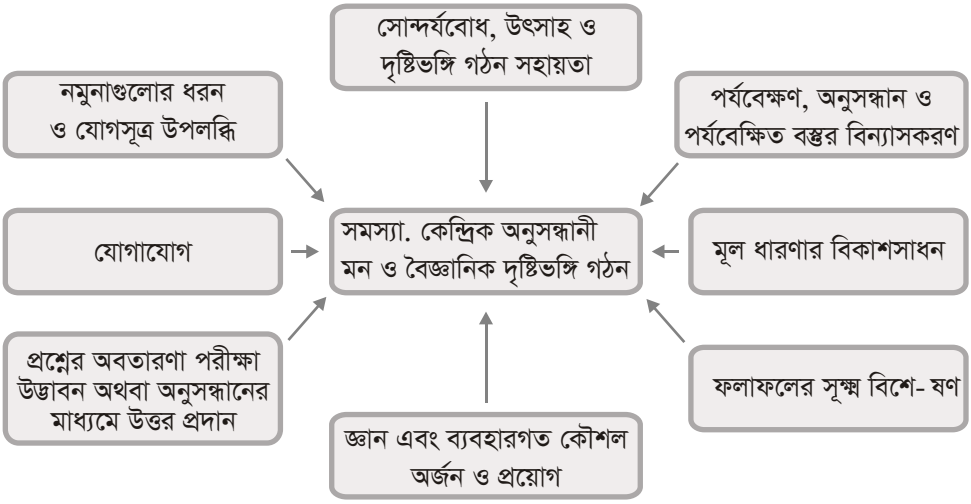

বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যাবলির কতিপয় উদ্দেশ্য

প্রাথমিক স্ড়রে বিজ্ঞানের শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যপুস্ড়ক পরিমার্জন

প্রাথমিক স্ড়রে অন্যান্য পাঠ্যপুস্ড়কের মতো *পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)* বিষয়ের পাঠ্যপুস্ড়কগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৮২-৮৩ সালে সংশোধন ও পরিমার্জন করে ১৯৮৪-৮৫ ও ৮৬ সালে নতুন আঙ্গিকে শ্রেণীকক্ষে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক স্ড়রের পাঠ্যপুস্ড়কগুলোর ধারাবাহিকতায় ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্ড়কগুলো পরিমার্জনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এগুলোর ক্রম অগ্রগতি, মানোন্নয়ন ও উল- ম্ব সমন্বয়ের (Vertical articulation) প্রয়োজনে নিচের স্ড়র (এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্ড়র) এবং ওপরের স্ড়রের (এ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্ড়র) মধ্যে সংযোগ ও সুসমন্বয় করার কথা অত্যাবশ্যক অনুভূত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করার পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ার ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক স্ড়রের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় । এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮৫-৮৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্ড়বায়ন ত্বরান্বিত করার তাগিদে প্রাথমিক স্ড়রের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ (১৯টি) পুনঃনির্ধারণ, পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী কর্তৃক অর্জনযোগ্য ৫৩টি প্রান্ড়িক যোগ্যতা সুনির্দিষ্টকরণ এবং প্রচলিত সকল বিষয়ের প্রতিটির জন্য শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসহ আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন করা

হয়।

সেকেন্ড প্রাইমারি এডুকেশন সেক্টর প্রজেক্ট এর আওতায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় ২০০১-০২ সালে। পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত লক্ষ্য নিম্নরূপ:

বাংলাদেশের শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত উদ্দেশ্য এখন ২২টি। এ স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা এখন ৫০টি। পরিমার্জিত ১৫ থেকে ১৭নং উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

১৫. জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

১৬. তথ্যের উৎস, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করা।

১৭. শিশুকে পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা এবং পরিবেশের দূষণ রোধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

শিক্ষাক্রম কমিটি মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে অধিক ফলপ্রসূ ও প্রয়োগমুখী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল:

প্রতি শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা, ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, বাড়ি ও বিদ্যালয় সংলগ্ন বাগানে ও ক্ষেত খামারে কাজ করা, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন ও বিজ্ঞান ক্লাব গঠন।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা ১৯৮১-৮৩ সালেই চালু করা হয়। নবম-দশম শ্রেণীর পরিমার্জিত বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের সাথে শিক্ষক-নির্দেশিকা ১৯৮৮ সাল থেকে চালু করা হয়।

শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রধান উপকরণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। স্বাধীন দেশের নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত *পরিবেশ পরিচিতি* এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর *সাধারণ বিজ্ঞান* বিষয়ের প্রথম প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলোর বৈশিষ্ট ছিল:

ক. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব প্রদান, অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে স্থানীয় উপকরণের ওপর নির্ভরতা ;

খ. মেধাবী ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর সংযোগস্থাপন ;

গ. পর্যাপ্ত অনুশীলনীর সন্নিবেশ যাতে তত্ত্বগত ও সমস্যা সমাধানমূলক উভয় ধরনের প্রশ্ন থাকে ;

ঘ. পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার সীমিত রাখা ;

প্রতিটি অধ্যায়ই শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে *এসো নিজে করি* নামে প্রায় দুই শত পরীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে যে-সকল

বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ খুবই সীমিত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব ছিল সেই সব বিদ্যালয়ের পক্ষে এ ধরনের শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ বড় ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশির দশকের প্রথম থেকেই অনগ্রসর বিদ্যালয়গুলোর জন্যই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু হয়।

১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম আশির দশকের গোড়ার দিকে প্রবর্তন করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তখনকার দিনে প্রচলিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয় ষাটের দশকে। এই দুই স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়নের ব্যাপারে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও পরিকল্পিতভাবে এই দু'স্তরের জন্য ব্যাপক কোন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। ফলে নব্বই-এর দশকের শুরুতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম কর্মবিমুখ ও যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে। তেমন পরিস্থিতিতে দেশের মাধ্যমিক স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী ও জীবনোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পুনর্বিন্যাস ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড একযোগে কাজ শুরু করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তদানীন্তন শিক্ষা সচিব-এর সভাপতিত্বে একটি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। শিক্ষাক্রম টাস্কফোর্স নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যাস এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সংস্কারের উদ্দেশ্যে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি শিক্ষাক্রম কাঠামো প্রণয়ন করেন। এই কাঠামোর আলোকে শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যাস, পরিমার্জন ও প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলে। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান, নীতিমালা নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনা বেসরকারিকরণ- বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (NCCC) গঠন করা হয়।

এখানে উলে- খ করা দরকার যে, ১৯৯৪-৯৫ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়নকালে নবম-দশম শ্রেণীতে ১৯৮৩ সালে সাময়িকভাবে প্রবর্তনকৃত মানবিক শাখা ও বিজ্ঞান শাখার পাশাপাশি 'ব্যবসায় শিক্ষা' শাখা নামে আরো একটি নতুন শাখা প্রবর্তন করা হয়। আরও উলে- খ্য, ১৯৮৩ সালে প্রবর্তিত বিজ্ঞান শাখার জন্য প্রথম পত্র ভৌতবিজ্ঞানকে ভেঙে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান নামে দুটি পৃথক বিষয় প্রবর্তন করা হয়। অপরদিকে সাম্প্রতিককালে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের সাথে পরিবেশ বিজ্ঞান ও জনসংখ্যা শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির ফলে জীববিজ্ঞানের কলেবর যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেলেও সেই বিষয়টিকে পূর্বাবস্থায় রেখে দেওয়া হয় এবং এখন পর্যন্ত তা একই নামে চালু আছে।

১৯৮৩ সালে মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য এক পত্রের একটি সাধারণবিজ্ঞান বিষয় প্রবর্তন করা হয়।

১৯৯৪-৯৫ সালে তা পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত রূপে মানবিক শাখা এবং ব্যবসায়শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ১৯৯৬ থেকে নবম ও ১৯৯৭ থেকে দশম শ্রেণীতে প্রবর্তিত হয়ে আজও তা চালু আছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞানবিষয়ক ও বৃত্তিমূলক যে-দুটি লক্ষ্য অর্জন করার কথা সেই দুটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

১. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সমর্থ করা।

২. শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ:

১. এ স্তরের শিক্ষাক্রমকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, বিশেষ করে এই অঞ্চলের দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার সমমান সম্পন্ন করা।

২. জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এমনভাবে শিক্ষাক্রমকে পুনর্বিন্যস্তকরা যাতে শিক্ষার্থী আত্মকর্মসংস্থানে ও উপার্জনে সমর্থ হয়।

মাধ্যমিক স্তরের নবপ্রবর্তিত বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের নতুনত্ব

ক. কম্পিউটার শিক্ষা : মাধ্যমিক স্তরে পরিমার্জিত রূপে প্রবর্তন করা।

খ. সাধারণবিজ্ঞান : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়াগত দক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

গ. পদার্থবিজ্ঞান : এক্সরে এবং পারমাণবিক বিকিরণের ফলে মানুষ ও জীব-জগতের ক্ষতির আশংকা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

ঘ. রসায়নবিজ্ঞান : সাধারণ বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করা, ইলেকট্রোপে- টিং, সাবান তৈরি।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, সাধারণবিজ্ঞান, ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি, সামাজিকবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইসলামশিক্ষা, আরবি ও ব্যবসায় পরিচিতি।

১৭টি বিষয়ে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৫২,২০৩ জন।

(বি:দ্র: শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন এবং বিস্তরণের মত এক সুবিশাল কর্মকাণ্ড পৃথক বিবেচনার দাবি রাখে বিধায় অতি সংক্ষেপে এখানে তা উলে- খ করা হল)।

১৯৮৩ সালে নবম শ্রেণীতে প্রবর্তিত ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিষয়ের নতুন পাঠ্যসূচি ও তদনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তক ১৯৮৩ সালে নবম শ্রেণীতে প্রবর্তন করা হলে অনেকেই তা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা শুরু করেন। তেমনি এক পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনতিবিলম্বে তদানীন্তন জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের (NCDC) নেতৃত্বে বিজ্ঞান মূল্যায়ন কমিটি (Science

Evaluation Committee-SEC) অনুমোদন করেন।

বিজ্ঞান মূল্যায়ন কমিটির ওপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল:

১. পাঠ্যসূচি পুন:পরীক্ষণ করে পুনর্বিবেচনা-পূর্বক এর সম্ভাব্য সংশোধন করা,

২. ১৯৭৮ সালে সরকার কতৃক গঠিত NCSC কর্তৃক নির্ধারিত যুগোপযোগী শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা তলিয়ে দেখা এবং

৩. ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্ড়কগুলো মূল্যায়ন করা।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের বিষয়-বিশেষজ্ঞ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীশিক্ষক, NCDC I NIEAER এর বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গটি বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞান মূল্যায়ন কমিটি সময়োপযোগী ও বাস্ড়বায়নযোগ্য পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে।

ভৌতবিজ্ঞানের জন্য ভাববস্ড়ু (Theme) নির্ধারণ করা হয় 'Energy' এবং জীববিজ্ঞানের জন্য নির্ধারণ করা হয় 'Man and his Environment' এবং এ দুটি ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস করা হয়। NCDC কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি উপজেলার একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ভৌত/জীববিজ্ঞানের একজন শিক্ষক / শিক্ষিকা এতে অংশ নেন।

এ কার্যক্রম শুর" করার প্রাথমিক পর্যায়ে এক গুচ্ছ প্রশ্নোত্তরিকা তৈরি করা হয় এবং তা ময়মনসিংহ ও ঢাকা শহরের কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-মূল্যায়ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রশ্নোত্তরিকা পুনরায় পরিমার্জন করে চূড়া"ড়করা হয়।

২১টি জেলা সদরে সংশি- ষ্ট শিক্ষকদের নিয়ে একদিনের একটি পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়। দেশব্যাপী এ ধরনের ২১টি সভা পরিচালনা করেন পাঁচ জন প্রশিক্ষক। প্রশিক্ষকরা হলেন:

১. জনাব এম. এ. জব্বার, পরিচালক, এনসিডিসি।

২. জনাব এ. এ. আজীজ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিডিসি।

৩. জনাব মুহাম্মদ আলী, বিশেষজ্ঞ, এনসিডিসি।

৪. ড. এম. আনোয়ার"ল হক, বিশেষজ্ঞ, নিয়েয়ার।

৫. জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিন, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিডিসি।

দেশব্যাপী ৪৬৫টি বিদ্যালয়ের ৪৬৫ জন শিক্ষক / শিক্ষিককে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জনানো হয়। তন্মধ্যে ৪০৭ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীদের দিনশেষে সামান্য কিছু যাতায়ত ভাড়া ও অফিসের ঠিকানাসহ একটি খামে প্রচলিত পাঠ্যসূচি, প্রস্ড়াবিত পাঠ্যসূচি, প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তরিকা ও তা পূরণের নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়। ৯০% শিক্ষক ফরম পূরণ করে যথারীতি তা নির্দেশিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন। সামগ্রিকভাবে এ কর্মযজ্ঞের জন্য তখন খরচ হয়েছিল মাত্র ৮২,৫০০/- টাকা।

প্রশ্নোত্তরিকা বিশে- ষণ করার পর বিজ্ঞান মূল্যায়ন কমিটি সরকারের কাছে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করেন:

১. প্রচলিত বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্ড়ক জর"রি ভিত্তিতে পরিমার্জন করা হোক, তাতে বইয়ের সাধারণ মান

বাড়বে, ভুল-ত্রুটি ও তথ্যভ্রান্তির নিরসন হবে।

২. পরিমার্জিত / সংশোধিত পাঠ্যসূচি মোতাবেক বিজ্ঞানের নতুন পাঠপুস্তক রচনা করা হোক, মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনাকালে এ ধ্যান-ধারণাকে বহুলভাবে উৎসাহিত করা হয়। বলা হয় শিক্ষক নির্দেশিকাসহ নতুন পাঠ্যপুস্তক ১৯৮৬ থেকে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৩. ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের SSC-তে বিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চলতি পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংগতিপূর্ণ করা হোক।

৪. ১৯৮৬ সালের SSC পরীক্ষাতে অনুরূপ সংগতি আনতে হবে।

৫. নবায়নকৃত পাঠ্যসূচির সাথে বিজ্ঞানের সংগতিপূর্ণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হোক।

৬. বি. এড এবং চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচি পরিমার্জন করা হোক যাতে শিক্ষকগণ আধুনিক সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতির সাথে নিজেদেন খাপ খাইয়ে চলতে পারেন।

সকলের জন্য বিজ্ঞান (Science for All)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর এই অগ্রগতির যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে কেবল কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করাই যথেষ্ট নয়। দেশের সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও চেতনা সঞ্চারিত হতে হবে ব্যাপকভাবে। এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত হল মাধ্যমিক স্তরে পর্যন্তসকল শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা। ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন এই সুপারিশ করেন।

উপরিউক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন সাধন ও ব্যাপক হারে বিস্তৃতির লক্ষ্যে আরও অনেক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যে-সকল বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সুবিধা এখনো সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি, সেগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। যে-সকল শিক্ষক আধুনিক বিজ্ঞান ধারায় এখনও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি, তাদের প্রত্যেককেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি কম পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান বিষয়গুলোর পাঠ্যসূচি ক্রমাগতভাবে পরিমার্জন ও নবায়নের ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে জরুরিভিত্তিতে। দেশব্যাপী বৈজ্ঞানিক চেতনা ও কর্মোদ্যোগ সঞ্চারকে জাতীয় অগ্রধিকার প্রদান করে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অঙ্গিভূত করতে হবে। তাহলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কথা ভাবতে পারবে।

মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণীতে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করার চেষ্টা দীর্ঘকালের। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন এবং শিক্ষাক্রম কমিটির রিপোর্টেও তা গুরুত্বের সাথে উলে- খ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হিসেবেই মূলত মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে তখন বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যাবলি ছিল প্রধানত শিক্ষককেন্দ্রিক। এ অবস্থার কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক-নির্দেশিকায় বেশ কিছু ব্যবহারিক কাজের নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে এগুলো হাতে-কলমে তখন যেমন খুব কমক্ষেত্রে করানো বা দেখানো হত আজ ২০০৬ সালে যে তারচেয়ে খুব বেশি কিছু করানো হচ্ছে তা কিন্তু বলা যাবে না। ষষ্ঠ

থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ড়বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষাক্রমে যেভাবে বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. শিক্ষার্থীদের মনে তাদের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহল এবং সচেতনতা জাগিয়ে তোলা,

২. শিক্ষার্থীদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করতে উৎসাহিত করা,

৩. যুক্তিসিদ্ধ চিন্ড়ার দক্ষতা গড়ে তোলা,

৪. বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা,

৫. উপরিউক্ত দক্ষতাসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবন এবং সাধারণভাবে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

মনে করা হয়েছিল উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই অর্জন করা সম্ভব । তবে বিজ্ঞান শিক্ষার যথাযথ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত দক্ষতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকগণের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণাদিও সরবরাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তদুপরি বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগত মান অনেকগুলো শর্ত পূরণের ওপর নির্ভরশীল, যেমনঃ

১. যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্ড়ক,

২. বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকের শিক্ষাগত ব্যুৎপত্তি, প্রশিক্ষণ, কাজের প্রতি আগ্রহ ও প্রেরণা,

৩. বাস্ড়র সুযোগ সুবিধা- যেমন বইপত্র, পরীক্ষাগার, শিক্ষাসহায়ক প্রয়োজনীয় উপকরণ ও আর্থিক বরাদ্দ,

৪. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন পদ্ধতি,

৫. বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনঃ বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাস্ড়বক্ষেত্রে সফলকাম করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি বিজ্ঞানাগার, তারপর প্রয়োজন কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং দক্ষ শিক্ষকের। আমাদের দেশের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই তখন এ ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল না। তেমন এক পরিস্থিতিতে 'সকলের জন্য বিজ্ঞান' সহ 'একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রবর্তনের পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে দ্বি-মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তখন বলা হয় যে এটি ছিল একটি অন্ড়র্বর্তীকালীন ব্যবস্থা।

বিজ্ঞান শিক্ষার ভৌত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সরকার দুটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্প দুটি হলঃ

ক. বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন প্রকল্প এবং

খ. ১৫০টি বেসরকারি মাদ্‌রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন প্রকল্প।

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রকল্প দুটির ব্যয় মেটানো হয়। প্রকল্প দলিলে বিদ্যালয় / মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষেরও নিজেদের তহবিল থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার কথা ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই তেমন সামর্থ্য ছিল না। এছাড়া দেশের সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় প্রকল্প দুটির পরিসর এবং পরিধিও ছিল সীমিত।

এদিকে ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের শিক্ষা সেক্টরের একটি মিশন বাংলাদেশ সফরে এসে মাধ্যমিক স্ড়রের বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণদানে আগ্রহ দেখালে প্রকল্প দুটির বাস্ড়বায়ন

সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে কারিগরি সাহায্য চান। ব্যাংক তাতে রাজি হয়ে ইউনেস্কোর একটি উপদেষ্টা টিমকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে সেই টিম তাদের চূড়ান্তরিপোর্ট পেশ করে।

১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে একটি তথ্য অনুসন্ধান মিশন আসে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এবং মে মাসে যথাক্রমে আসে প্রাক-মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন মিশন। বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যাংকের প্রতিনিধিদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সভা অনুষ্ঠান শেষে ১৯৮৪ সালের ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি মোতাবেক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে সহজ শর্তে তিন কোটি সত্তর লাখ ডলার ঋণদানে সম্মত হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক দুটি প্রকল্প একীভূত করে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৫ সালের ৩০ এপ্রিল ঋণ কার্যকর হলে সেই দিন থেকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১১২ কোটি ২৩ লাখ টাকা। ইউএনডিপি থেকে প্রাপ্ত অনুদানে উপদেষ্টাদের খরচ এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যয় মেটানো হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক স্তরে সার্বিকভাবে, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। এর বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

ক. মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভৌত সুযোগ-সুবিধা এবং সংশিষ্ট শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও সংশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

খ. মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিকতর সহজলভ্য করে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা এবং গুণগত মানের মধ্যকার বিরাজমান পার্থক্য হ্রাস করা।

গ. একটি জাতীয় এবং আটটি আঞ্চলিক মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা এবং চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণকে জোরদার করা।

ঘ. বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটসহ সংশিষ্ট প্রশাসনিক, তত্ত্বাবধায়ক ও পরিদর্শন কর্মকর্তাদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঙ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা তত্ত্বাবধান, শিক্ষা-গবেষণা ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি ও জোরদার করা এবং শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের উন্নয়ণ ঘটানো।

চ. সংস্কার সাধন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন সংক্রান্তকার্যক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মক্ষমতা জোরদার করা।

প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয় মোট ৪০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। এর মধ্যে ৩৮০০ টি

ছিল বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২০০ টি মাদ্‌রাসা। প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

'ক-১' শ্রেণী: যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার আদৌ কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না সে-ধরনের শ্রেণীভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আনুমানিক তিন লাখ টাকা ব্যয়ে একটি বিজ্ঞানাগার এবং একটি 'মালটিপারপাস' কক্ষ নির্মাণ করে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠান প্রতি ২৬,০০০ টাকার আসবাবপত্র, ৫৭,০০০ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য এবং ১,৩০০ টাকার বইপত্র সরবরাহ করা হয়। ১২০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৩৮ টি মাদ্‌রাসা ছিল 'ক-১' শ্রেণীভুক্ত।

'ক-২' শ্রেণী: যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল তেমন ধরনের এই শ্রেণীভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মোটামুটিভাবে ১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি 'মালটিপারপাস' কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠান প্রতি ১৫,২০০ টাকার আসবাবপত্র, ৩৭,০০০ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য এবং ১,৩০০ টাকার বইপত্র সরবরাহ করা হয়। ৩০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫০টি মাদ্‌রাসা 'ক-২' শ্রেণীভুক্ত ছিল।

'ক-৩' শ্রেণী: উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পর্যন্ত বিজ্ঞান পড়ানো হয় এমন ধরনের ১২টি মাদ্‌রাসা ছিল এই 'ক-৩' শ্রেণীভুক্ত। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মোটামুটিভাবে ৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয়ে দুটি বিজ্ঞানাগার ও একটি 'মালটিপারপাস' কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠান প্রতি ৩৪,৩০০ টাকার আসবাবপত্র, ৯৭,০০০ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য এবং ১,৩০০ টাকার বই-পত্র সরবরাহ করা হয়।

'খ' শ্রেণী: যে-সব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার ছিল কিন্তু তাতে যন্ত্রপাতির অভাব ছিল এমন ধরনের ২,৩০০টি বিদ্যালয় ছিল এই শ্রেনীভুক্ত। এসব বিদ্যায়ে কোন নির্মাণ কাজ করা হয় নি। প্রতিষ্ঠান প্রতি ৩৭,০০০ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য এবং ১,৩০০ টাকার বইপত্র সরবরাহ করা হয়। উপরিউক্ত ৪,০০০ প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পর্যায়ক্রমে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত মানোন্নয়ের জন্য চাকুরিকালিন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কোন প্রতিষ্ঠান তখন আমাদের দেশে ছিল না। একারণে চাকুরিকালিন প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় নয়টি মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ চত্বরেই কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হয়। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ চত্বরে স্থাপিত কেন্দ্রটিকে বলা হয় 'জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র' (National Secondary Education and Science Development Centre - NSESDC) অপর আটটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়: ময়মনসিংহ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ (পুরুষ) এবং রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, রংপুর ও যশোর শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ চত্বরে।

জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্রে একজন নির্বাহী পরিচালক, একজন উপ-নির্বাহী পরিচালক, নয় জন সহকারী অধ্যাপক, একজন একাডেমিক সুপারভাইজার ও একজন লাইব্রেরিয়ানসহ মোট ৪৮ জন স্টাফ (১৩ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ জন অপরাপর কর্মচারী) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে নির্বাহী পরিচালক ও লাইব্রেরিয়ান বাদে প্রতিটিতে ১১ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৪২ জন স্টাফ থাকার কথা ছিল। বাস্তবে কী ছিল ?

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন

মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প বাস্ড়বায়নের সার্বিক দায়িত্ব ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের। বাস্ড়বক্ষেত্রে একজন প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্ড়বায়ন ইউনিট-এর ওপরই প্রকল্পের দৈনন্দিন কাজকর্ম, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও বাস্ড়বায়নের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। শিক্ষাভবনের ষষ্ঠ তলায় প্রকল্প বাস্ড়বায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা করার জন্য দু'জন করে উপ-প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক, একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, একজন সহকারী প্রকৌশলী, একজন প্রকিউরমেন্ট কর্মকর্তা, দুজন গবেষণা কর্মকর্তা, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন সহকারী প্রকিউরমেন্ট কর্মকর্তা এবং ৩৫ জন সাহায্যকারী কর্মচারী ছিলেন। প্রকল্প বাস্ড়বায়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ছয় জন উপদেষ্টা প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন। মাঠ পর্যায়ে ২১টি বৃহত্তর জেলায় ২১টি আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং দুজন করে অন্যান্য কর্মচারীও ছিলেন। সকল প্রকার নির্মাণ কাজের দায়িত্ব অর্পিত ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানীন্ড়ন ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের ওপর। দেশের ১০টি প্রশিক্ষণ কলেজ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ড় কাজে সহায়তা করে। অপরাপর সহযোগী সংস্থার মধ্যে ছিল তদানীন্ড়ন বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড এবং নেয়েয়ার অর্থাৎ বর্তমানের নায়েম।

পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড পথ চলা শুর" করার পর পরই তার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের রেখে যাওয়া সামগ্রিক মানবসম্পদ ক্রমে সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ড়তা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের সাথে একীভূত হয়ে যায়।

যাঁরা বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রযাত্রার সাথে আশি ও নব্বই-এর দশকে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের মতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অবস্থা তেমনটি নেই। তাই সময় এসেছে-বিজ্ঞান শিক্ষার সংস্কার সাধনের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ড় সংশি- ষ্ট সকলকে জাগ্রত করা।

তথ্যপঞ্জি

১. The Curriculum Committee Report for Secondary Education, Education Ministry, Government of Pakistan, 1960 (Headed by Professor Taj Mumammad Khayal, Chairman, Board of Secondary Education, Lahore).

২. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

৩. মাধ্যমিক স্ড়রের (নবম-দশম শ্রেণীর) ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্ড়ক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (খসড়া), ১৯৮৩

৪. জীববিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প, ১৯৯০

৫. আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ১৯৯১

৬. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, নিম্ন-মধ্যমিক স্ড়র (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) রিপোর্ট: প্রথম খন্ড- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৫

৭. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাধ্যমিক স্তর (নবম – দশম শ্রেণী) রিপোর্ট: দিত্বীয় খন্ড- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৫

৮. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, উচ্চমাধ্যমিক স্তর (একাদশ – দ্বাদশ শ্রেণী) রিপোর্ট: তৃতীয় খন্ড -জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৫

৯. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন (খসড়া), সেকেন্ড প্রাইমারি এজুকেশন প্রজেক্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০১-২০০২

১০. জীববিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প, ১৯৯০

হেম্যাথ: একটি অনলাইন গণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মো: মোক্তার হোসেন*

অনেকেরই ধারণা গণিত একটি নিরস সাবজেক্ট । তাই অনেকের মধ্যেই গণিতভীতি দেখা যায়। অনেকে মনে করেন জীববিজ্ঞান এবং রসায়নের চেয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যার মতো বিষয়গুলো অনেকটাই জটিল এবং রসহীন। তাঁদরে মতে, রসায়নে তো রস আছেই, জীববিজ্ঞানে অনেকটা ,পদার্থবিদ্যায় একটু থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু গণিতে মোটেই রস নেই। কিন্তু এই রসহীন বিষয় গণিত থেকেই কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তি কম্পিউটারের জন্ম। কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ (১৭৮১-১৮৮১) ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। আর নিচের ক্লাসের না হলেও ওপরের দিকে গণিত এবং পদার্থবিদ্যার মূল বিষয়গুলো একে অন্যের পরিপূরক। সুতরাং গণিতের মতো একটি 'নিরস' বিষয়কে যদি কোনভাবে রসালো করে একবার কব্জায় আনা যায় তবে বিজ্ঞানের অন্য বিষয়গুলোও সহজ হতে বাধ্য। বুঝতে পারলে গণিতের মতো একটি নিরস বিষয়ও সবার জন্য মজাদার এবং আকর্ষণীয় হতে পারে। এ প্রসঙ্গে গণিত বিষয়ে একটি গল্প বলতে চাই। নারিকেল একটি মজাদার এবং সুস্বাদু ফল। এই ফলটি কেউ কখনো খায়নি কিংবা খেতে পছন্দ করে না আমাদের দেশে হয়তো এমন লোকের দেখা পাওয়া যাবে না। কিন্তু নারিকেল ফলটা খেতে কিন্তু বেশ কষ্ট আছে। কেউ একটা নারিকেল পেয়ে যদি সেটি পেয়ারা বা আপেলের মতো করে খেতে শুর" করে সে কিন্তু কখনো নারিকেলের প্রকৃত স্বাদ খুঁজে পাবে না। নারিকেলের প্রকৃত স্বাদ পাবার জন্য প্রথমে এর বহিরাবরণ বা ছোবরা খুলতে হবে; তারপর এর ভিতরের শক্ত খোলস বা খুলি ভাঙতে হবে। তবেই এর প্রকৃত মজা পাওয়া যাবে। সুতরাং বলা হয়ে থাকে, যে কখনো একবার নারিকেলের স্বাদ পেয়েছে তার জন্যে নারিকেলের ছোবরা বা খোসা ভাঙা কোন কঠিন কাজ নয়। গণিত বিষয়টিও ঠিক এমনই। কেউ একবার গণিতের মূল বিষয়গুলো বুঝতে পারলে গণিতের সব সমস্যা পানির মতো সহজ বলে মনে হতে বাধ্য। ভারতের 'হেম্যাথ' নামক একটি অনলাইন প্রতিষ্ঠান গণিত শিক্ষাকে সরস ও প্রাণবন্ড়করে তুলছে।

গণিত মূলত একটি যুক্তি শেখার বিষয়। কিন্ড়ু উপযুক্ত ও প্রশিক্ষকহীন শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণের অভাবে অনেক দেশের স্কুল কলেজ এবং এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাহিত্য, কবিতা ও হিসাব শিক্ষার মতো গণিত শেখানো হয়। ফলে অনেক শিশু-কিশোরের মধ্যে গণিতভীতি দেখা যায়।

এ সমস্যাটি মাথায় রেখে গণিত শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে ২০০০ সালে ভারতের দু'জন তর"ণ তথ্য প্রযুক্তিবিদ হর্ষরাজন ও নির্মল সঙ্করণ লন্ডনে তাদের চাকরিতে ইস্ড়ফা দিয়ে দেশে ফিরে ব্যাংক লোন নিয়ে 'হেম্যাথ' নামক একটি গণিত শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। সেটি ছিল ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলেনিয়াম ম্যাথমেট্কিস প্রজেক্টের অংশ বিশেষ। বর্তমানে ভারতের মধ্য চেন্নাইয়ে

---

* মো: মোক্তার হোসেন – সহকারী অধ্যাপক (কম্পিউটার বিজ্ঞান), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: mokter@gmail.com

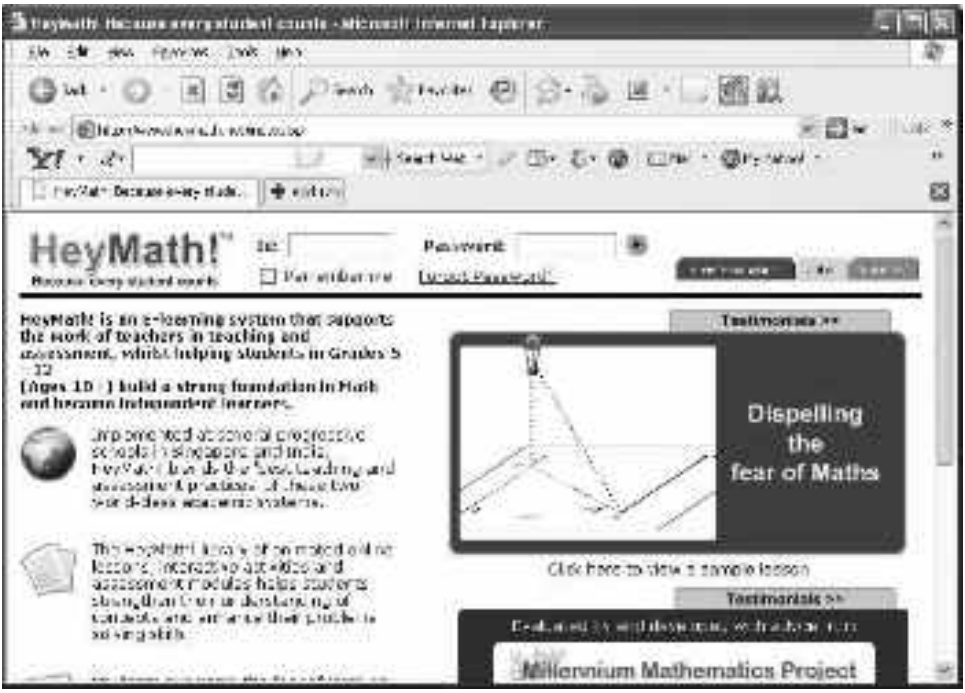

চিত্র: হেম্যাথ ইনডেক্স পেজ

অবস্থিত হেম্যাথ কার্যালয়ে গণিত শিক্ষক, প্রোগ্রামার এনিমেশন ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার সহ প্রায় চলি- শজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলস কাজ করে চলেছেন।

ইন্টারনেট এক্সপে-ারার কিংবা তদরূপ কোন ব্রাউজার প্রোগ্রাম চালু করে এর এ্যাড্রেসবারে www.heymath.net লিখে এন্টার কী চাপলে হেম্যাথ ইনডেক্স পেজ (www.heymath.net/index.jsp) চালু হয়। এই পেজ থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক বা বিদ্যালয়কে 'হেম্যাথ' এর গ্রাহক ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। হেম্যাথ কোম্পানি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বার্ষিক ১০০ ডলার করে ফি নেয়। তবে ভারতের বিদ্যালয়গুলোর জন্য শিক্ষার্থী প্রতি ফি ৬০০ রুপি করে। হেম্যাথের রেজিস্ট্রেশন করতে এই সাইটের সব সুবিধা পাওয়া যায়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে যারা হেম্যাথের নমুনা পদ্ধতিগুলো পরখ করে দেখে তারপর রেজিস্ট্রেশন করতে চান হেম্যাথ তাদের জন্য ফ্রি পরীক্ষামূলক ভার্সন ব্যবহারের সুবিধা রেখেছে।

হেম্যাথ ইনডেক্স পেজের ওপরে ডান দিকের Free Evaluation ট্যাবে ক্লিক করলে একটি রেজিস্ট্রেশন পেজ ওপেন হয়। সেখানে ব্যবহারকারীর নাম, ঠিকানা, বয়স, শ্রেণী, ই-মেইল, 'হেম্যাথ' এ্যাড্রেস প্রভৃতি তথ্য লিখে প্রেরণ করলে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রেরকের ই-মেইল 'হেম্যাথ' কাস্টমার সার্ভিসের পক্ষ থেকে একটি ফিরতি ই-মেইল পাঠানো হয় যাতে হেম্যাথ ব্যবহারের আমন্ত্রণ ও নিয়মাবলি এবং একটি পরীক্ষামূলক আইডি ও পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়। এই পরীক্ষামূলক আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এর

ব্যবহারকারীর দু'সপ্তাহ মেয়াদে যতবার খুশি হেম্যাথ এর ফি স্যাম্পল সেশনগুলো পরখ করে দেখতে পারেন। তবে পরীক্ষামূলক ব্যবহারকারীদের জন্য হেম্যাথ-এর সীমিত সংখ্যক সমস্যার সমাধান ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। হেম্যাথ-এর ফুল ভার্সন রেজিস্ট্রেশনের জন্য গণিতের গ্রেড-৫ থেকে গ্রেড-১২ পর্যন্ড় সকল শ্রেণীর বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ক্যালকুলাস, জনমিতি প্রভৃতি বিষয়ের সব রকমের সমস্যার অসংখ্য উদাহরণ ও নমুনা দেওয়া আছে।

'হেম্যাথ' এর ত্রিমাত্রিক চিত্র, এনিমেটেড ছবি, সহজ সাবলীল ইংরেজি ধারাবর্ণনা ও ভিজুয়াল তথ্য প্রত্যক্ষ প্রদর্শন পদ্ধতি ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের নিকট গণিতের কঠিন সব সমস্যাকে সহজ বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। 'হেম্যাথ' প্রচলিত বোর্ড-ডাস্টার ও কাগজ-কলমে দ্বিমাত্রিক উপায়ে উপস্থাপিত চিত্রের মাধ্যমে জ্যামিতি শিক্ষার পরিবর্তে মনিটর কিংবা প্রজেক্টরের বড় পর্দায় ত্রিমাত্রিক চিত্রের মাধ্যমে ধাপে ধাপে জ্যামিতি শিক্ষা দেয়। উদাহরণস্বরূপ সমান্ড়রাল রেখার ধারণা দেখার জন্য সরাসরি রেললাইন এবং বিপ্রতীপ কোণ বুঝানোর কাচির ফলা কিংবা আড়াআড়ি স্থাপিত দুটো দন্ডের ব্যবহার করা হয়েছে। হেম্যাথে গেমস্ খেলার মাধ্যমেও শিশুরা গণিতের প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় শিখে নিতে পারে।

মূলত গণিতের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি ও অনীহা এবং ভালো গণিত শিক্ষকের তীব্র সংকট-এ দু'টি সমস্যার কথা মাথায় রেখে হেম্যাথ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের শতাধিক বিদ্যালয়ে 'হেম্যাথ' পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ম্যাসাচুসেট অঙ্গরাজ্যের শিক্ষাদপ্তর হেম্যাথকে অনুমোদিত শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পাঠ্যক্রমে অন্ড়র্ভুক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বিদ্যালয়গুলো থেকে গণিতের ২৫

হাজার সমস্যার সমাধান ‘হেম্যাথ’ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এসেছে। যুক্তরাজ্যের যেসব শিশু গণিত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল তারাও এখন গণিতপ্রেমী হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে হেম্যাথ অত্যন্ত জনপ্রিয় আর ভারতে হেম্যাথের ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে প্রযুক্তিতে অনেকখানি পিছিয়ে থাকলেও আগ্রহী অনেক পাঠক-অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাধ্যমে আমাদের দেশেও এর ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আর অচিরেই হেম্যাথ গণিত গুগল হিসেবে সারা বিশ্বের গণিতপ্রেমীদের মাঝে পরিচিতি লাভ করবে সে প্রত্যাশা এখন অনেকেরই ।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট ও দৈনিক প্রথম আলো।

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

ড. মুহম্মদ আজহারুল ইসলাম *

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর করার জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ধীরে ধীরে গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বহু বেসরকারি সংগঠন বয়স্ক শিক্ষার্থী, কিশোর এবং শিশুদের জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম হাতে নেয়। একসময় এ সকল কার্যক্রমের স্থায়িত্বের জন্য এবং সাক্ষরসমাজ গঠন করার মানসে নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা চর্চার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গৃহীত হয় অনুসারক শিক্ষা কার্যক্রম। পরবর্তীকালে অনুসারক শিক্ষা কার্যক্রম শুধু শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধক কার্যক্রমসহ জীবনমান উন্নয়নমুখী নানা ধরনের কার্যক্রম। সব কিছুকে এক কথায় বলা হয় অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম।

বেসরকারি সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে বেগবান করা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার জন্য ১৯৮০ সাল থেকে বেসরকারিভাবেও সাক্ষরতা চালু হয়। নব্বইয়ের দশকে সরকারিভাবে পরিচালিত সাক্ষরতা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রায় ৪০০টি বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও। দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও এডিবির আর্থিক সহায়তাপুষ্ট এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয় শতশত কর্মীবাহিনী।

মূলত বেসরকারি সংগঠনগুলো নিজেদের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে স্ব-স্ব সংগঠনে সাক্ষরতা কার্যক্রম ব্যাস্থাপনার একটি ভিত রচনা করে। তবে অপেক্ষাকৃত ছোট ও নবীন সংগঠনগুলোর ওপরই নির্ভর করে থাকে। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে ধাপে ধাপে অনেক বেসরকারি সংস্থার জন্ম হয়েছে এবং হাজার হাজার কর্মী বাহিনী সাক্ষরতা পরিসরে নানা ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই কর্মরত রয়েছেন ব্যবস্থাপনার নানা পর্যায়ে। কিন্তু এসকল কর্মীবাহিনীর জন্য ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণাসম্পন্ন তেমন কোনো বই এখনও প্রণীত হয় নি। এমতাবস্থায় অনেক দেরিতে হলেও তপন কুমার দাশ কর্তৃক প্রণীত ও রাশেদা কে. চৌধূরী ও শফি আহমেদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রকাশিত বইটি সময়ের প্রয়োজন মেটাবে বলে আমাদের ধারণা।

আলোচ্য 'সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা' বইটিতে মোট ১৬ টি অধ্যায় রয়েছে। তার মধ্যে ১ম ও ২য় অধ্যায়। সম্ভবত সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্যই বইতে যুক্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মৌলিক শিক্ষার ইতিহাস অত্যন্ত চমৎকার ও বিশে- ষণাত্মক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই মৌলিক শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ কিভাবে ঘটেছে এবং নানা পর্যায়ে

* ড. মুহম্মদ আজহারুল ইসলাম – সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিভাবে সমাজের বৃহত্তম শ্রেণী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছে তার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এ অধ্যায়ে। বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠায় ২য় অনুচ্ছেদে শ্রী তপন কুমার দাশ লিখেছেন :

ভারতীয় শিক্ষা বিস্ড়রের লক্ষ্যে উড-এর 'ডেসপাচ'-এ মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ড় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হলেও কার্যত তার প্রয়োগ হলো না। বরং এদেশে বেশ কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ইংরেজি শিক্ষার অনুকরণে বিশেষ ধরনের স্কুল গড়ে উঠতে থাকল। বিশেষ করে ১৮৫৮-'৭২ সালের মধ্যে সারা ভারতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও স্থানীয় করের মাধ্যমে ইংরেজি স্কুলের অনুকরণে অনেক স্কুল গড়ে ওঠে। ফলে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হলো। ইংরেজদের অধীনে চাকরি পাওয়াই হয়ে উঠল এ শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের বৃহত্তর অংশ রয়ে গেল অন্ধকারেই ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষা, সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষার সংজ্ঞা, ধারণা, প্রয়োজনীয়তা, পরস্পরের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়টি যে-কোনো পরিসরে কর্মরত শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গবেষকদেরও পঠন-উপযোগী। এ অধ্যায়টির সংযোজন নিঃসন্দেহে বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়েই মূলত ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে এবং পুরো অধ্যায় জুড়েই রয়েছে ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি বিকাশের ইতিহাস। মেথেলেথিক কালচার থেকে শুরু করে শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি, টেইলর, ফয়েল, টমাসম্যুর এবং মেকিয়াভেলি-বিষয়ক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের আলোচনাও সংযোজিত হয়েছে এ অধ্যায়ে। লেখক অত্যন্ড় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কিভাবে কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা থেকে শিল্প ব্যবস্থাপনার উদ্ভব ঘটেছে এবং শিল্প-ব্যবস্থাপনা থেকে উন্নয়ন-ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা এবং সবশেষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা নামে পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ঘটেছে। এ অধ্যায়টিতে লেখক একজন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু আলোচনা করেছেন।

বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় থেকে মূলত শুরু হয়েছে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের ধারণা। টেইলর, ফয়েল এবং পরবর্তীকালের ম্যুর কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থপনার ধারণার আলোকে ভারতীয় ও বাংলাদেশী ব্যবস্থাপকদের উদ্ধৃত করে, গণসাক্ষারতা অভিযান প্রণীত প্রশিক্ষণ উপকণের সূত্র ধরে লেখক প্রথমেই সাক্ষরতা ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি সাক্ষরতা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার পাঁচটি উপাদান চিহ্নিত করেছেন এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূহে একটি একটি করে উপাদানের পরিচিতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী নামক আলোচনায় লেখক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার জনগোষ্ঠী কারা এবং কেন দরিদ্র মানুষের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার প্রবর্তন করা হল তার পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছেন। অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী নির্বাচনের যে-প্রক্রিয়া তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সে অনুসারে কার্যক্রম পরিচালিত হলে এদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সহজসাধ্য হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে কত ধরনের কুশলী কর্মী প্রয়োজন তাদের দায়-দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার লিখেছেন ব্যাংককভিত্তিক এটিএলপি ম্যানুয়েলে সাক্ষরতা অব্যাহত শিক্ষার কুশলীদের তিনটি স্ড়রে বিভাজন করা হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কুশলীদের স্ড়র চারটি। এ অধ্যায়ে তিনি নিম্নরূপ পিরামিড ব্যবহার করে কুশলীদের স্ড়র ও তাদের সংখ্যাগত অবস্থান বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। পিরামিডের স্ড়রগুলো হল:

ক. পরিচালক, সমন্বয়ক, ব্যবস্থাপক

খ. উপকরণ উন্নয়নবিদ, প্রশিক্ষক, পরিবীক্ষক, মূল্যায়ক, গবেষক, আঞ্চলিক কর্মকর্তা

গ. তত্ত্বাবধায়ক, সংগঠক, মাঠপ্রশিক্ষক, তথ্য-সংগ্রাহক

ঘ. সহায়ক, শিক্ষক/শিক্ষিকা, সেবক /সেবিকা

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার উপকরণ নিয়ে। লেখক প্রথমে উপকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং শিক্ষা কার্যক্রমে কত ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হয় তা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন, যা থেকে উপকরণ উন্নয়নকারী কর্মীগণ অশেষ উপকৃত হবেন বলে ধরে নেয়া যায়। অষ্টম অধ্যায়ে প্রথমত তিনি নানা ধরনের শিখন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষণ কাকে বলে,প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোপরি একটি প্রশিক্ষণ আয়োজনে যা যা করতে হয় তার সব কিছুই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রশিক্ষণের তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে যোগ হয়েছে ব্যবহারিক দিকসমূহ। এ অধ্যায়টি পড়ে প্রশিক্ষকরা উপকৃত হবেন বলে আমার ধারণা।

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন ও পরিচালনার জন্য কি কি তৎপরতা বা পদক্ষেপ নিতে হবে তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নবম অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে তিনি সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন প্রক্রিয়ার তৎপরতাসমূহের পরিচিতি দিয়েছেন। এরপর এসকল তৎপরতা নিয়ে এক একটি আলাদা অধ্যায় বইতে সংযোজিত হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে এসেছে শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠনের নিয়মাবলি ও কর্মতৎপরতাসমূহ। এ অধ্যায়ে প্রথমেই প্রকল্প প্রস্ড়াবনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে,তারপর শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠনের নানামুখী তৎপরতাসমূহ আলোচিত হয়েছে। একাদশ অধ্যায়টি প্রণীত হয়েছে তত্ত্বাবধান নিয়ে।

এমনিভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও সামাজিক আন্দোলন, এডভোকেসি ও সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ড়গ্রহণ এবং অব্যাহত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে।

উপর্যুক্ত প্রতিটি অধ্যায়েই আলোচ্য বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সর্বোপরি উপর্যুক্ত দ্বাদশ অধ্যায় থেকে ষোড়শ অধ্যায়ের প্রতিটি অধ্যায় নিয়েই দুটো করে অধ্যায় রচিত হতে পারতো, হয়তোবা সংক্ষিপ্ত করার জন্যই এ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কি করতে হবে তার আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। ১১৭ নং পৃষ্ঠা থেকে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী নির্বিচনের প্রক্রিয়া, ১২৬ নং পৃষ্ঠা থেকে কুশলীদের দায়-দায়িত্ব, ১৩৮ নং পৃষ্ঠা থেকে উপকরণ উন্নয়নে অনুসৃত তৎপরতাসমূহ, ১৯২ নং পৃষ্ঠা থেকে প্রশিক্ষণক্রম প্রণয়ন-এর বাস্ড়ব দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে ২১৬ নং পৃষ্ঠা থেকে যেমন প্রকল্প প্রস্ড়াবনা প্রণয়নের পদক্ষেপগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আবার ২১২ নং পৃষ্ঠায় একটি প্রকল্প প্রস্ড়াবনা প্রণয়ন করে দেখানো হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে বইয়ের ২৩৭ নং পৃষ্ঠায় তত্ত্বাবধানের পরিসর, ২৫১ নং পৃষ্ঠা থেকে উদ্বুদ্ধকরণের বিভিন্ন কৌশল, ২৭৫ পৃষ্ঠায় এডভোকেসী টুলস ও পদ্ধতিসমূহ, ২৮৯ পৃষ্ঠা থেকে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবস্থামূলক তৎপরতা, ৩১৯ নং পৃষ্ঠা থেকে নেতৃত্বের কৌশলসমূহের আলোচনায় মাঠ পর্যায়ে উলে- খিত কাজ কিভাবে সম্পাদিত হবে তার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। বইয়ের ভূমিকায় গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী লেখকের দীর্ঘদিনের কর্ম-অভিজ্ঞতার প্রশংসা করেছেন। এর যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় বইটিতে। সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত মাঠকর্মী থেকে ব্যবস্থাপক প্রাকটিশনারগণ এ বই থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি, এ গ্রন্থটিতে প্রায় প্রতিটি

বিষয়েই তত্ত্বীয় আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি আলোচ্য বিষয়েই প্রখ্যাত ব্যবস্থাপক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের সংজ্ঞা উদ্বৃত করা হয়েছে। এসব সংজ্ঞা ও আলোচনা পাঠককে আলোকিত করবে নিঃসন্দেহে। এই বইয়ের আরও উলে- খযোগ্য দিক হল বিভিন্ন বিষয়ে দার্শনিক ব্যবস্থাপকদের সংজ্ঞার পাশাপাশি বাংলাদেশে কর্মরত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপকদের ধারণা ও সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, সহায়ক উপকরণ,প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, এডভোকেসি, নেতৃত্ব, অব্যাহত শিক্ষা ইত্যাদি আলোচনাতে এ দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বদের মতামতসমূহ গ্রন্থিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত এ বইয়ের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

গ্রন্থে উলে- খিত নানা আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে ব্র্যাক, প্রশিকা, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, এফআইভিডিবিসহ কোডেক, সিডিএ-ইত্যাদি আঞ্চলিক সংস্থাসমূহেরও উদাহরণ টানা হয়েছে। সব আলোচনাকেই উদাহরণ সহযোগে বাস্ড়ব অবস্থার সঙ্গে মিলানো হয়েছে বলেই হয়ত পাঠক বইটি পড়ে বেশি লাভবান হবেন।

অপরদিকে, বইটিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন, এ বইতে শিক্ষা, সাক্ষরতা, ব্যবহারিক শিক্ষকের ধারণা অংশে লেখক ইচ্ছে করলেই আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেখা বইপত্রের উলে- খিত ধারণাসমূহ যোগ করতে পারতেন। ব্যবস্থপনার ধারণায় টেইলর, ফয়েল, ম্যুর, মেকিয়াভেলীর ধারণার বিস্ড়রিত আলোচনা রয়েছে কিন্তু ওয়েবার-এর ধারণা এত সংকুচিত হল কেন তা বোঝা গেল না। এ অংশে বাংলাদেশী কিংবা ভারতীয় কোন ব্যবস্থাপকের ধারণার সন্নিবেশ বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারত নিঃসন্দেহে । কার্যক্রম প্রক্রিয়া অংশে প্রকল্প প্রস্ড়বনার ধারণায় ২/১ টি দাতা সংস্থার ফরমেট এমন কি 'বিএনএফই' প্রদত্ত ফরমেটটি সংযোজিত হতে পারত। অপরাপর ব্যবস্থাপনা বইয়ের মত নিয়ন্ত্রণ, পুঁজি সংগঠন কিংবা আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহের অনুপস্থিতিও বইটির সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ন করেছে।

পরিশেষে বলা যায় নানা সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও 'সাক্ষারতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা' গ্রন্থটি শিক্ষাসংশি- ষ্ট এনজিও কর্মীদের কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তা ছাড়া সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে যারা জানতে আগ্রহী তাদের কাছেও বইটি সহায়ক হবে।